রাত পোহাবার কত দেরি

মুফতি আবু জান্দাল জালালাবাদী

Scanned by CamScanner

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ,

প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, লেখক - প্রকাশক এবং প্রকাশনী সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে। আমি জানি এভাবে লেখক - প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিত বইয়ের অনলাইন সংস্করণ বা পিডিএফ তৈরি করা ইসলাম সম্মত নয় কিন্তু বর্তমান চলমান ফিতনা, ফাসাদ এবং উম্মার জিহাদ ও কিতালপন্থী ভাইয়েদের মাঝে পরস্পর মতভেদ ও মতভিন্নতাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ধোয়াসা দেখে আমার অন্তর অশান্ত হয়ে পরে এবং আমি অনুভব করি এই বইটি সকল সচেতন মুসলিমের হাতে পৌছানো উচিৎ। যদিও শত্রুর হাতেও এটি পৌছানো সম্ভবনা তৈরি হয় কিন্তু নিশ্চয়ই আল্লাহর কৌশলই সর্বোত্তম।

বইটি বাজারে পাওয়া যায় না অনেকদিন যাবত। কিন্তু একজন সচেতন মুওয়াহিদের জন্যে এই বইটি এখন খুবই দরকার। ইতিমধ্যেই ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা তাদের রামরাজত্বের সংবিধান এবং মানচিত্র প্রকাশ করেছে। পতাকা প্রকাশিত হয়েছে বহু আগেই। তাই আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই, এখন - এই মুহুর্ত থেকেই আমাদের সকল প্রস্তুতির ধাপ শুরু করতে হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি বাংলাদেশে ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারকদের অবস্থা ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি কিছু ঘটনার মাধ্যমে। ঢাকার রাস্তায় তাদের স্লোগান, চট্টগ্রামে তাদের সমাবেশ এবং দেশব্যাপি ইসকন, বাজরাংদল ও আর এস এস কর্মিদের আগ্রাসন আমাদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ধরা পরেছে। উম্মার মা-বোনেদের নিয়ে তাদের ঘৃণ্য কৌশল ইতিমধ্যেই আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সরকার ও প্রশাসনে তাদের অংশগ্রহণ থেকে নিয়ে সেনাবাহিনীতে তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারেও আমরা জানতে পারেছি বিভিন্ন অনলাইন আলোচনা থেকে। যা স্বীকার করেছেন, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারাই। তাই এখনই সময় এই বইটিকে নিজেদের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করার। মুরজিয়া এবং খারেজিদের পথ ছেড়ে "আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ" এর পথে নিজেদের পরিচালিত করার। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, হকের পথে অটল রাখুন। আমীন

Scanned by CamScanner

প্রারম্ভিকা

সমস্যার কথা তো সবাই বলে; কিন্তু সমাধান কয়জন উপস্থাপন করে! আমাদের এ বইটির গ্রন্থনার উদ্যোগ মূলত সমকালীন সমস্যার সমাধানকল্পে। আমরা চেষ্টা করেছি, মুসলিম উম্মাহর ওপর সারা বিশ্বজুড়ে যে সমস্যাগুলো চেপে আছে, তা থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে। এ ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সফল হয়েছি, তা বিচারের দায়িত্ব পাঠকের কাঁধে অর্পণ করলাম। আমরা আমাদের অপরিণত মস্তিষ্ককে উম্মাহর জাতীয় সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করার জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত মনে করিনি। তাই উম্মাহর অমিততেজা শার্দূল, মহান আলিম মুজাহিদ ও দায়িদের চিন্তার আলোকে আমরা এই রচনাকে সাজিয়েছি, যার কারণে এটাকে মৌলিক রচনা না বলে সংকলনধর্মী রচনা বলাই সংগত। এখানে সমস্যার সমাধানকল্পে যেসব তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে, তার কোনোটাই কল্পনাপ্রসূত নয়; বরং সবগুলোই অভিজ্ঞতালব্ধ।

যেসকল মহান মনীষীর চিন্তাচেতনা, গবেষণা, তত্ত্ব ও তথ্য, ফাতওয়া এবং রচনা-প্রবন্ধ থেকে আমরা উপকৃত হয়েছি, আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটিকে উম্মাহর হিদায়াতের জন্য কবুল করুন। ফিতনার এই ভয়াবহ সময়ে এর দ্বারা উম্মাহর সামনে যথোচিত কর্তব্য প্রতিভাত করুন। আমিন।

বান্দা আবু জান্দাল জালালাবাদী
বায়তুল গুরাবা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

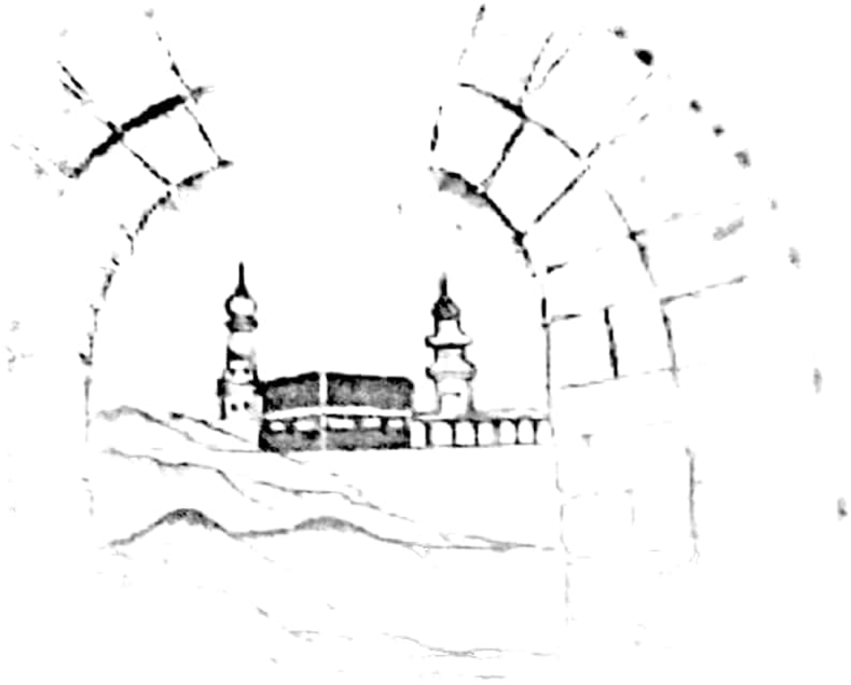

বিষয়সূচি

জিহাদ করতে চাই; কিন্তু কীভাবে ৯

যেভাবে এ দেশে দীন কায়েম হবে ১৮

নিষ্ক্রিয় সমর্থক যখন 'মানহাজি ভাই' ৩৪

ফোরথ জেনারেশন ওয়ারফেয়ার এবং গাজওয়া ম্যানহাটন ৪৯

নিকটবর্তী শত্রুর ধোঁকা ৬৭

গ্লোবাল জিহাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৭৬

শাসক ছাড়া কীভাবে জিহাদ করব ৯৩

ইমারাহ ও খিলাফাহ কী ও কেন ১২৭

Scanned by CamScanner

জিহাদ করতে চাই; কিন্তু কীভাবে

এক. গ্লোবাল জিহাদ মডেল

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জিহাদের যে পদ্ধতি চলমান, তা হচ্ছে জিহাদের গ্লোবাল মডেল। অর্থাৎ, সারা দুনিয়াব্যাপী জিহাদ একই মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে। এই বিষয়টি জানা দরকার এ জন্য যে, আমাদের জিহাদি যেকোনো কাজ গ্লোবাল জিহাদের বাইরে নয়। অর্থাৎ, আপনি একা করেন বা কোনো দলের সঙ্গে করেন, আপনার জিহাদি কাজ এমন হওয়া দরকার, তা যেন গ্লোবাল জিহাদের কাজের সহায়ক হয়। এই জিহাদের কাজ যদিও অঞ্চলভেদে ভিন্ন হতে পারে; কিন্তু দিন শেষে প্রতিটি কাজ একই মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য। যেমন একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কুফরের সর্দার অ্যামেরিকার স্বার্থে আঘাত করা। এখন আলাদা আলাদা ভূখণ্ডের জন্য এই উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। এটা জরুরি নয় যে, প্রতিটি ফ্রন্টে একই কৌশলে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া গ্লোবাল জিহাদ মডেলের জন্য এটাও জরুরি নয় যে, আপনাকে কোনো দল বা জামাআতের সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে। যদি আপনি কোনো হকপন্থি জিহাদি জামাআত বা দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, তবে তা সবচেয়ে উত্তম; কিন্তু আপনি যদি কোনো হকপন্থি জিহাদি জামাআতের সঙ্গে যুক্ত হতে না-ও পারেন, তবুও আপনার জন্য জিহাদের কাজ বন্ধ নয়; বরং আপনি নিজে 'একাকী মুজাহিদ' (ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় Lone Wolf) বা কয়েকজন সমমনা দীনি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে 'উলফ প্যাক' হিশেবে কাজ করতে পারেন।

Scanned by CamScanner

দুই. ইম্প্রোভাইজড আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার

এটাও আমাদের জানা জরুরি যে, আমাদের বর্তমান জিহাদের ধরন কেমন হবে! এই জিহাদ কোথাও কনভেনশনাল (প্রথাগত যুদ্ধ), আবার কোথাও গেরিলা ওয়ারফেয়ার। তবে অধিকাংশ জায়গায় এই যুদ্ধ 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা 'আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার'। তাই আমাদের জেনে রাখা দরকার, গেরিলা ওয়ারফেয়ার কেমন হয়, বিশেষ করে 'আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার'। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য এই বইটি দেখতে পারেন—*Mini Manual of the Urban Guerrilla* By Carlos Marighella।

একজন গেরিলাযোদ্ধার কিছু মৌলিক চাহিদা আছে; আর সেগুলোকে এককথায় প্রকাশ করার জন্য বলতে হয়, একজন গেরিলাযোদ্ধাকে প্রায় সকল বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। বর্তমানের জিহাদ আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারের ইম্প্রোভাইজড ভার্সন। অর্থাৎ, এটি আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার তো বটে; কিন্তু প্রতিনিয়ত এটি শত্রুর চালের সঙ্গে সঙ্গে এর কৌশল এবং প্রায়োরিটি ইম্প্রোভাইজড করে চলেছে।

তিন. ফ্রন্টের ধরন

ভূমির ধরন। যেকোনো যুদ্ধের জন্য 'ভূমির ধরন' বা সে এলাকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ারে ভূমির ধরন বা Terrain বলতে সাধারণত ভূমির ভৌগলিক অবস্থার বিবরণ বোঝায়; কিন্তু গেরিলা ওয়ারফেয়ারে বা আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারে এটি আরও বেশি কিছু বোঝায়। বর্তমান দুনিয়াতে ভূমির ধরন অনুযায়ী জিহাদের ময়দানগুলোকে (ফ্রন্টগুলোকে) কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, কিছু ফ্রন্ট আছে, যেগুলো সরাসরি কিতাল বা আর্মড কমব্যাটের জন্য উপযুক্ত। কিছু আছে যেগুলো সরাসরি আর্মড কমব্যাট বা কিতালের জন্য উপযুক্ত নয়, কোনোভাবেই নয়; বরং সে এলাকাগুলো সাপোর্টিং ল্যান্ড হিশেবেই বেশি উপযুক্ত। অর্থাৎ, ওই সমস্ত এলাকা 'আর্মড কমব্যাটের' জন্য উপযোগী নয়; বরং তা অন্য কোনো ফ্রন্টের জন্য সাপোর্টিং ল্যান্ড হিশেবে কাজ করার জন্য বেশি উপযুক্ত। কোন ল্যান্ড কী কাজের জন্য উপযুক্ত, তা কিছু বিষয়ের ওপরে নির্ভর করে। যেমন,

- ভূমির অবস্থা (পাহাড়ি, সমতল, মরুভূমি)।
- জনগণের অবস্থা (জিহাদের পক্ষে, জিহাদের বিপক্ষে)।

Scanned by CamScanner

- শাসকের ক্ষমতার অবস্থা (ক্ষমতার প্রয়োগ বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে কেমন)।

এবং এরকম আরও কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কোনো একটি ফ্রন্টের কাজের ধরন কেমন হবে। এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানার জন্য *Management Of Savagery*–By Abu Bakr Nazi”[১] এই বইটি পড়ে নিতে পারেন।

চার. শত্রু সম্পর্কে জানা

“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”

‘তুমি যদি তোমার শত্রুর সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে জানো, তবে ১০০ যুদ্ধ হলেও তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। তুমি যদি শুধু নিজেকে জানো; কিন্তু শত্রুর ব্যাপারে না জেনে থাকো, তবে প্রত্যেক বিজয়ের সঙ্গে তুমি পরাজয়ও পাবে। তুমি যদি শত্রু এবং নিজের উভয় ব্যাপারেই না জেনে থাকো, তবে তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই পরাজয়ের স্বাদ পাবে।’[২]

এখানে মূল যে বিষয়টি জানা দরকার তা হচ্ছে, শত্রু কীভাবে দুনিয়াব্যাপী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। সত্যি বলতে এটি অনেক বিশদ আলোচনা। এই বিষয়টিকে ভাসমান বরফখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, বরফের ওপর যা দেখা যায়, পানির নিচে তারচেয়েও অধিক বিদ্যমান, যা দেখা যায় না। ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার-শক্তির যে ক্রুসেড দৃশ্যমান, এরচেয়ে হাজারগুণ বেশি চক্রান্ত অধিকাংশের সামনে অদৃশ্য। কাফিরদের এই ক্রুসেড শুধু ‘ট্যাঙ্ক’ আর ‘এফ ১৫’-এর নয়; বরং তাদের এই যুদ্ধের আরও বড় একটি ক্ষেত্র হচ্ছে ‘ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড’। অর্থাৎ, আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দেওয়া। এবং এটিই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ। কারণ, আপনি ট্যাঙ্ক দেখতে পাবেন; কিন্তু তাদের এই চক্রান্ত আপনার চোখে সাধারণভাবে ধরা পড়বে না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, মুজাহিদদের শক্তির একটা বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায় শুধু এই সন্দেহ দূর করতে যে, ‘এখন কোনো জিহাদ নেই’। সারা দুনিয়াব্যাপী এখন জিহাদের আরেক রূপ হচ্ছে ‘মিডিয়া জিহাদ’। বাস্তবতা হচ্ছে, মিডিয়া এখন জিহাদের ৮০ ভাগ

---

১ যার আরবি নাম *ইদারাতুত তাওয়াহহুশ*।

২ *সান জু, দ্য আর্ট অব ওয়ার*।

Scanned by CamScanner

কিংবা আরও বেশি। আর এর কারণ হচ্ছে, শত্রুর আক্রমণের বড় একটা অংশ হচ্ছে মিডিয়াকেন্দ্রিক। শত্রুদের যুদ্ধের অন্যতম একটি কৌশল হচ্ছে 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ার'। আপনি যদি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন, বর্তমান সমাজে এই জিহাদবিমুখতা এবং জিহাদের ব্যাপারে অপব্যাখ্যার মূল কারণ হচ্ছে এই 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ার' বা 'প্রোপাগান্ডা'।

প্রত্যেকটি যুদ্ধের জন্য একটি আদর্শ দরকার হয়। যে আদর্শের জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফিররা পরিষ্কারভাবে জেনে গেছে যে, মুসলিমদের ইমান এবং আকিদাকে বোমা এবং গুলি দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই তারা বেছে নিয়েছে ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড। এখন তারা আকিদাকে শেষ করতে চায় না, তারা চায় আকিদাকে পরিবর্তন করে ফেলতে। আল্লাহ বলেছেন, (ভাবার্থ) 'কাফিরদের বন্ধু হিশেবে গ্রহণ করো না, তারা কখনো তোমাদের বন্ধু নয়।' অথচ মুসলিম এখন কাফিরদেরকেই বেশি আপন মনে করে! অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমাদের ওপরে কোনো হামলা হলে আমরা মনে করি, আমাদের কাফির বন্ধুরাই আমাদের নিরাপত্তা দেবে! নাউজুবিল্লাহ!

আপনি জিহাদ করতে চাইলে উপরে বর্ণিত চারটি বিষয় খুব ভালোভাবে জানা থাকতে হবে। কারণ, এই চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে আপনার পরবর্তী কাজের ধরন কেমন হবে।

যেমন, আপনি যদি 'গ্লোবাল জিহাদ মডেল' ভালোভাবে বুঝতে পারেন, তাহলে 'কোথায় জিহাদ করব?'—এই প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই বের করে নিতে পারবেন।

আপনি যদি 'শত্রু সম্পর্কে জানা' বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিতে পারেন, তাহলে 'কীভাবে জিহাদ করব?'—এই প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই বের করে নিতে পারবেন।

পাঁচ. আমি জিহাদ করতে চাই; কিন্তু কীভাবে

১. নিয়ত

সর্বপ্রথম আপনি নিজের নিয়ত ঠিক করবেন। ঠিক কেন এবং কী কারণে আপনি জিহাদ করতে চান? কারণ, প্রত্যেক কাজ তার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আপনি

Scanned by CamScanner

বিশ্বাস করেন কিংবা না করেন, আপনার জিহাদের কাজের জন্য কোনো জিহাদি দল, কমান্ডার বা কোনো শায়খ কোনো উপকারেই আসবে না, যতক্ষণ-না আপনার নিয়ত ঠিক হবে। কারণ, এই পথে চলার জন্য আপনার আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য দরকার হবে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো মুজাহিদের পক্ষে সফলতার দিকে এক কদমও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়! তাই সবার আগে আপনি আপনার নিজের নিয়ত ঠিক করে নিন।

২. ইলম

এরপরই সবার আগে যা দরকার তা হচ্ছে ইলম। আপনি যা কিছুই করেন না কেন, তার আগে আপনার সে বিষয় ইলম দরকার। আপনি যদি সত্যি জিহাদ করতে চান, তবে জিহাদের ব্যাপারে ইলম অর্জন করুন। অন্তত এটি সবার আগে আপনার জানা দরকার, আপনি কেন জিহাদ করবেন। জিহাদের এই পথ সোজা নয় এবং সংক্ষিপ্তও নয়। এই দীর্ঘ, বন্ধুর ও সুকঠিন সফরের জন্য আপনার দরকার হবে ইলম। আপনি যথাসম্ভব জিহাদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করুন। আর অবশ্যই আপনার অধ্যয়ন কুরআন এবং হাদিস দিয়ে শুরু করবেন। ইলম শুধু অর্জনের জন্য নয়; বরং যা কিছু শেখার তাওফিক আল্লাহ দেবেন, তার আলোকে আমলও চালিয়ে যেতে হবে। আমল ব্যতীত ইলম পরিপূর্ণ উপকার বয়ে আনে না; বরং তা ব্যক্তির বিপক্ষে প্রমাণ হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. আনসার কিংবা মুহাজির

জিহাদের জন্য দুটো আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে আনসার এবং মুহাজির। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি একজন মুহাজির হতে পারবেন, নাকি একজন আনসার হবেন? আনসার হওয়ার অর্থ হলো, আপনি কোনো একজন মুহাজির বা মুজাহিদ ভাইয়ের সহযোগী হবেন। আপনি আপনার অর্থ-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি যা কিছু আছে, তা দিয়ে জিহাদের আনসার হবেন। অথবা আপনি হিজরত করবেন; কিংবা একজন মুজাহিদ হবেন। সবাই মুহাজির হতে পারবে এমন কথা নেই; আবার সবাই আনসার হবে এমনও নয়। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেন, আপনি কোন কাজ উত্তমভাবে করতে পারবেন? যেটা আপনার জন্য উত্তম মনে হচ্ছে আপনি সেটার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। যদি আপনি মনে করেন আপনি হিজরত করে মুহাজির হতে পারবেন, তবে আপনি হিজরতের প্রস্তুতি নিন। আর যদি আপনি মনে করেন,

Scanned by CamScanner

আপনি আনসার হতে পারবেন, তবে আপনি নিজেকে একজন মুহাজির বা একজন মুজাহিদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন।

মুহাজির হিশেবে প্রস্তুতি নেওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ হলো, প্রথমে আপনি হিজরত করার নিয়ত করবেন, এরপর এর জন্য যা যা করা দরকার তার সবকিছুর প্রস্তুতি গুছিয়ে আনবেন। অনেকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে হিজরত করব? প্রশ্ন হিশেবে এটা অসংগত নয়। তবে আমি এবং আপনি যে ময়দানে আছি সে ময়দানের প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নটা একটু জটিল। আপনাকে একটা বিষয় বুঝতে হবে, জিহাদ সহজ কোনো বিষয় নয়। জিহাদে কষ্ট আছে, চ্যালেঞ্জ আছে, ঝুঁকি আছে। এই পথে অনেকটাই আপনাকে নিজে নিজে হাঁটতে হবে। এতে আপনার মন খারাপ করার বা কষ্ট পাবার কিছু নাই। কেন? কারণ, আপনিই প্রথম নন; বরং আপনার মতো সবাই-ই এরকমভাবে শুরু করে। আপনাকে শুরু করতে হবে এবং বাকি ব্যবস্থা আল্লাহ আস্তে আস্তে করে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় বিষয়, মানুষ বিদেশে স্কলারশিপের জন্য কতকিছু করে। বাইরের একটা চাকরির জন্য কত আবেদন করে। তাহলে জিহাদ কেন এর ব্যতিক্রম হবে? আপনি যদি হিজরত করতে চান, এই পথ আল্লাহ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ; কিন্তু শুরুটা আপনাকেই করতে হবে। আমি হিজরত করতে চাই—একথা বলে এই আশায় বসে থাকা চলবে না যে, কেউ একজন এসে আপনাকে হিজরতের রাস্তা দেখিয়ে দেবে; বরং আপনি নিয়ত নিয়ে শুরু করেন। দেখবেন, আল্লাহ আপনার জন্য রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। এমনটাই বরাবর হয়ে থাকে।

আনসার হিশেবে প্রস্তুতির অর্থ কী? অর্থাৎ, আপনি এখন মুহাজির বা মুজাহিদকে নিজের সমস্ত কিছু-অপেক্ষা অধিক ভালোবাসবেন। আপনি আপনার সবকিছু দিয়ে সেই মুহাজির বা মুজাহিদ ভাইয়ের সমস্ত প্রয়োজন, বিশেষভাবে সমস্ত জিহাদি প্রয়োজন পূরণের সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। হতে পারে আপনি সেই ভাইকে আপনার বাসায় রাখবেন; কিংবা আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন; কিংবা যেকোনো প্রয়োজনে আপনি সেই ভাইয়ের জন্য এগিয়ে যাবেন, যেকোনো বিপদে আপনি তার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন। এতে যদি আপনার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে হয় তবুও! এটিই হচ্ছে আনসারের কাজ। এখন আপনি নিজে ঠিক করে নেবেন আপনি কতটুকু পারবেন, কীভাবে পারবেন! হতে পারে আপনি আপনার বাসায় কোনো মুজাহিদ ভাইকে রাখতে পারবেন না; কিন্তু আপনি মাসে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ তার সহযোগিতায় দিতে পারবেন, তবে সেটাই করেন।

Scanned by CamScanner

৪. দাওয়াহ

ইলম অর্জনের পরে আপনি যখন ঠিক করে নিলেন আপনি আনসার হবেন নাকি মুহাজির বা মুজাহিদ হবেন, তখন অন্য প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি এবার দাওয়াতের কাজ শুরু করতে পারেন। এই দাওয়াতের বিষয়টি আসলে একটু ব্যাপক। আপনার মূল লক্ষ্য থাকবে চেতনা এবং আদর্শ হিশেবে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া। কারণ, কাফিরদের একটি চেষ্টা হচ্ছে চেতনা এবং আদর্শ হিশেবে জিহাদকে বিকৃত করে দেওয়া। তাই আপনার কাজ হবে কাফিরদের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়া। একই সঙ্গে আপনি বিশুদ্ধ ইমান এবং তাওহিদের দাওয়াতও দেবেন। এভাবে আপনি আস্তে আস্তে ছোট ছোট তয়িফা বা গ্রুপ গঠনের চেষ্টা করবেন। আপনি তাদের গড়ে তুলবেন এবং তাদের থেকে বিভিন্ন কাজ নিতে পারেন। তাদের আনসার কিংবা মুজাহিদ বা মুহাজির হিশেবে গড়ে তুলতে পারেন। এ ছাড়া আপনি তাদের বিভিন্ন জিহাদি কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেন। যেমন হ্যাকিং, মিডিয়া ইত্যাদি। এই কাজটি আসলে অত্যন্ত ব্যাপক, যদি আপনি তা এভাবে গ্রহণ করতে সাহসী এবং ইচ্ছুক থাকেন। এখানে বিষয়টি এমন যে, আপনি নিজে একজন মুজাহিদ হিশেবে গড়ে উঠবেন এবং একই সঙ্গে আরও অনেককে আপনার মতো মুজাহিদ হিশেবে গড়ে তুলবেন। প্রথম দিকে আপনি কী অর্জন করলেন, তা দেখতে যাবেন না; বরং আপনি শুধু এই চেষ্টা করবেন, যত বেশি সম্ভব জিহাদের চেতনা এবং আদর্শকে প্রচার করে যাবেন। জিহাদের আদর্শ মানে উগ্রতা নয়। জিহাদ বোঝেন—এমন অনেকে জিহাদের দাওয়াতকে উগ্রতা ভাবেন, এক্সট্রিমিজম ভাবেন, যদিও তারা মোটিভেটেড। কিন্তু আসলে আমি যা বলতে চাচ্ছি তা সেরকম কিছু না। আমি যখন বলছি জিহাদ একটি চেতনা, তখন এর উপস্থাপনা এমন সাবলীল এবং বাস্তবমুখী হতে হবে, যেন মানুষ বুঝতে পারে জিহাদ আলাদা কোনো বিষয় নয়; বরং নিজের ইমান এবং আকিদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই জিহাদ অপরিহার্য। আর এই কাজ আপনি সবার আগে আপনার নিজের পরিবার থেকে শুরু করতে পারেন। তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে, আপনি হিজরতের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর এবং সে অনুযায়ী আপনি চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন অবস্থায় দাওয়াতি কাজ করলে আপনার হিজরতের কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, তবে আপনি 'ইসতিখারা'-সাপেক্ষে দাওয়াতের কাজ বন্ধ রাখতে পারেন।

৫. জিহাদে অংশগ্রহণের ৪৪ উপায়

জিহাদে অংশগ্রহণের প্রায় ৪০-এর অধিক উপায় আছে। শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি রাহ.-এর বিখ্যাত লেকচার আছে 44 Ways of supporting Jihad। এই লেকচারটি শুনে নিতে পারেন বা এই ম্যানুয়ালটি পড়ে নিতে পারেন। এরপরে আপনার নিজের জন্য যে কাজটি সবচেয়ে সহজ হয়, সেটি দিয়ে শুরু করেন। তারপর আস্তে আস্তে আরও বেশি উপায়ে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতে থাকেন। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়া জিহাদ যখন ফরজ, তখন জিহাদের প্রস্তুতিও ফরজ। এখন আমার কিংবা আপনার এই বলে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই যে, আমি তো জানি না কীভাবে জিহাদ করব! আমি তো জানি না কার সঙ্গে জিহাদ করব! কিছু করতে না পারলেও অন্তত প্রস্তুতি নিতে হবে—আনসার হিশেবে কিংবা মুজাহিদ বা মুহাজির হিশেবে।

আবারও বলছি, জিহাদের ফরজিয়াত পূরণের জন্য কোনো দল বা জামাআতের সঙ্গে অংশগ্রহণ জরুরি নয়। হকপন্থী দল বা জামাআতের খোঁজে থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে; কিন্তু এই অপেক্ষায় বসে থাকা যাবে না। এখানে একটি বাস্তবতা আমাদের বোঝা দরকার—আমি কোন দলের সঙ্গে যোগ দেবো? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আপেক্ষিক। একই সঙ্গে যুদ্ধের ধরন অনুযায়ী ময়দানে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আশা করা ঠিক নয়। মনে করেন, আপনি একটি গেরিলা ইউনিটের কমান্ডার। আপনাকে কেউ একজন ফেসবুকে নক দিয়ে বলল, আমি আপনাদের ইউনিটে যোগ দিতে চাই, কীভাবে জয়েন করব বা কোথায় জয়েন করব? আপনি এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন? নিরাপত্তার কারণে আপনার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বাস্তবতাও তা-ই। আপনি যদি আশা করেন, কেউ একজন আপনাকে বলে দেবে, কীভাবে কী করতে হবে, কোথায় জয়েন করতে হবে, তাহলে আপনি ভুল করছেন। তাহলে আপনি হয়তো নিজেকে জানেন; কিন্তু আপনার শত্রুকে জানেন না। এ ক্ষেত্রে আপনার কোনো একটি সফলতা এলে তার সঙ্গে একটি ব্যর্থতাও থাকবে।

আমি জিহাদ করতে চাই—একথা বলা সবচেয়ে সহজ; কিন্তু একথা বলে সে অনুযায়ী আমল করা কঠিন। আমলকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধরে রাখা আরও কঠিন—যদি-না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে সহজ করে দেন। আপনাকে এখনই সব করে ফেলতে হবে এমন নয়; বরং আপনি নিজেকে প্রস্তুত করেন সময় নিয়ে। মনে রাখবেন, আপনি যদি আল্লাহর সঙ্গে সত্য থাকেন, আল্লাহও আপনার সঙ্গে সত্য থাকবেন। আপনি

Scanned by CamScanner

যদি সত্যি জিহাদি কাফেলার সঙ্গে শরিক হতে চান, আপনাকে জামাআতের সঙ্গে শরিক করার দায়িত্ব আল্লাহর। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে ভাবার বিষয় হচ্ছে, একবার জামাআতের দেখা পাবার পর আপনি সেই পরিস্থিতির জন্য কতটুকু প্রস্তুত? এমন অনেক ভাই আছেন, যারা জিহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু যখন জিহাদের কঠিন বাস্তবতা সামনে হাজির হয়েছে, তখন তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তারা এই কঠিন পথ পাড়ি দেওয়ার সাহসটুকু যোগাড় করতে পারেননি; কিংবা তারা পথিমধ্যেই ঝরে গেছেন!

আপনার প্রতি আমার শেষ কথা, আপনি মুজাহিদ হিশেবে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং নিজেকে একজন মুজাহিদ হিশেবে গড়ে তুলুন। আর মুজাহিদদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾

আর যদি তারা (জিহাদের পথে) বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই তার জন্য কিছু-না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত; কিন্তু তাদের যাত্রা আল্লাহ অপছন্দ করলেন। তাই তিনি তাদের নিবৃত রাখলেন এবং তাদের বলা হলো, বসা লোকদের সঙ্গে তোমরা বসে থাকো। [সুরা তাওবা : ৪৬]

Scanned by CamScanner

যেভাবে এ দেশে দীন কায়েম হবে

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবিত পথ হলো দাওয়াত ও জিহাদ। দাওয়াত হলো আগ্রাসী ক্রুসেডারদের হুমকির বিষয়ে উম্মতকে সচেতন করে তোলা। তাওহিদের সঠিক ব্যাখ্যা তাদের নিকট পরিষ্কার করে দেওয়া যে, বিধান প্রদান এবং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলারই অধিকারভুক্ত; অন্য কাউকে মোটেও এই অধিকার দেওয়া হয়নি। এর পাশাপাশি দীনের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সকল অঞ্চলের মুসলমানদের একতার ওপর গুরুত্বারোপ করা। আল্লাহর ইচ্ছায় এটা হবে রাসুল ﷺ-এর পদ্ধতি অনুসারে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। এ পর্যায়ে দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই দুটি ধাপে সম্পন্ন হবে :

১. অগ্রবর্তী মুজাহিদদেরকে শিক্ষিত ও উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া, যারা ক্রুসেডার ও তাদের তাবেদারদের মোকাবিলার মহান দায়িত্বভার বহন করছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত তা বহন করতে থাকবেন।

২. জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা, যেন তারা তাদের তাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইসলামের পক্ষে যোগদান করে এবং এর জন্য কাজ করে। সুতরাং সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে মনোযোগ দিতে হবে, যাতে তাদের সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ করে তোলা যায়। একইভাবে মুজাহিদবাহিনীর মধ্যে আরও অধিক-মাত্রার সচেতনতা ও বোধশক্তির উন্নয়নে অধিক মনোযোগ দিতে হবে, যেন একটি সুসজ্জিত, সংঘবদ্ধ, আদর্শিক এবং সচেতন মুজাহিদবাহিনী গঠন করা যায়, যারা হবে ইসলামি আকায়িদে দৃঢ় বিশ্বাসী, ইসলামি বিধিবিধান পালনে অটল এবং মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর। সেই সঙ্গে যারা আলিম এবং বাগ্মীতার অধিকারী, তারা যাতে মুজাহিদদের বিভিন্ন শ্রেণি

Scanned by CamScanner

থেকে নির্বাচিত হয়ে সামনের কাতারে চলে আসে, তা সুনিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর পাশাপাশি জিহাদের বার্তা ও আদর্শ যথাযথভাবে সংরক্ষিত করার জন্য এবং মুসলমানদের মধ্যে জিহাদি দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার করার জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের জিহাদের ক্ষেত্রে সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রথম টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু হবে কুফরের (আন্তর্জাতিক) কেন্দ্র অ্যামেরিকা, তার মিত্র ইসরায়েল, ভারত এবং চীন। দ্বিতীয় টার্গেট হবে তাদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক মিত্র, যারা মুসলমানদের দেশগুলোর শাসক।

১. অ্যামেরিকাকে লক্ষ্যবস্তু বানানো

অ্যামেরিকাকে টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু বানানোর উদ্দেশ্য হলো, তাকে নিঃশেষ করে ধ্বংসের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া, যেন তা সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্যবরণ করে এবং তার সামরিক, জনবল ও অর্থনৈতিক ক্ষতির দরুন নিজ ভারেই মুখ থুবড়ে পড়ে। এর ফলস্বরূপ আমাদের ভূমিগুলোতে তাদের প্রভাব খর্ব হয়ে যাবে এবং তাদের মিত্রদেরও একের পর এক পতন হতে থাকবে।

নিকট অতীতের আরব-বিপ্লবে যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা অ্যামেরিকার কুপ্রভাবের পতনের ঈঙ্গিত বহন করে। আফগানিস্তান এবং ইরাকে মুজাহিদদের হাতে অব্যাহত নাস্তানাবুদ হবার পর এবং সেপ্টেম্বর ২০০১-এর পর থেকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তা ক্রমাগত হুমকির মুখে পড়ায় অ্যামেরিকা এখন মুসলিম দেশসমূহের জনগণের চাপের মুখে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি এখন স্ফীত হয়ে মোড় নিয়েছে তাদের তাবেদারদের দিকে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে, আগত পর্যায়টি আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে অ্যামেরিকার প্রভাব আরও কমে যাওয়া এবং পশ্চাদপসরণের ফলে অ্যামেরিকার তার নিজ খোলসের ভেতরে আরও বেশি ঢুকে যাওয়ার সাক্ষী হয়ে থাকবে, যা তাদের দোসর ও তাবেদার সরকারসমূহকেও দুর্বল করে দেবে।

২. মুসলিম দেশে অ্যামেরিকার তাবেদার সরকারকে লক্ষ্যবস্তু বানানো

অ্যামেরিকার তাবেদারদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর ব্যাপারে বলতে হলে এর বাস্তবতা একেক জায়গায় একেক রকম। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে, তাদের সঙ্গে যেকোনো সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া উচিত। তবে সেই সব দেশ ব্যতীত, যেখানে সম্মুখসমরে তাদের মোকাবিলা করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

Scanned by CamScanner

সামরিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কুফরের কেন্দ্র অ্যামেরিকাকে অব্যাহতভাবে দুর্বল করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে, যাবৎ-না অ্যামেরিকা তার সামরিক এবং অর্থনৈতিক উভয় খাতে দেউলিয়া হয়ে যায়, তার জনশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণ ও একাকিত্বের পর্যায়ে পৌঁছে নিজেকে নিজ খোলসে ফিরিয়ে নেয় (যা আল্লাহর ইচ্ছায় খুবই নিকটে)।

সকল মুজাহিদ ভাইয়েরা অবশ্যই বিশ্বের যেকোনো অংশে পশ্চিমা জায়নবাদী ক্রুসেডার জোটের স্বার্থে আঘাত করাকেই অগ্রগণ্য দায়িত্বরূপে গ্রহণ করবেন। এ লক্ষ্যে অবশ্যই তাদেরকে সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু ঢেলে দিতে হবে।

এর পাশাপাশি ভারতে এবং বাংলাদেশে অ্যামেরিকান ও ইসরায়েলি টার্গেটের পরে আমাদের অগ্রগণ্য টার্গেট হলো এখানকার সাপের মাথা ভারতীয় সরকার। এর কারণ :

- ভারতীয় সরকার কাশমির ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার, তাদের বসতবাড়ি ধ্বংস, তাদের শ্রেণি-বৈষম্যের মাধ্যমে দুর্বল করা এবং তাদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর কৌশল শুরু করেছে। কাশমির এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।
- ধর্মহীনতা এবং ইসলামের প্রতি অন্ধ-শত্রুতা এবং দীনের শত্রুতার পৃষ্ঠপোষকতা ভারতের স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রনীতির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং অন্য প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভারতের এই কৌশলের প্রভাব পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।
- ভারত এই উপমহাদেশের পুরো ভূখণ্ডে (কাশমির, ভারত, বাংলাদেশ এবং বার্মায়) ইসলামি ও জিহাদি জাগরণের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকা, রাশিয়া এবং ইসরায়েলের বিশ্বস্ত মিত্র।
- ভারত বাংলাদেশে ধর্মহীন সরকার এবং ধর্মহীন আন্দোলনগুলোর সবচেয়ে বড় রক্ষক এবং রাসুল ﷺ-এর অবমাননাকারীদের ও মুলহিদদের সব ধরনের সহযোগিতা দানকারী।
- ভারত বাংলাদেশের মুসলমানদের পানি কব্জা করে তাদের চাষাবাদকে ধ্বংস করা এবং বাংলার মুসলমানদের কলকারখানা এবং ব্যবসাকে দখল করার মতো অপরাধ করে যাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারত সব সময় এটাই চায় যে, বাংলার মুসলমানেরা তার দাস হয়ে থাকুক।

Scanned by CamScanner

- ভারতের রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা ইসলামি ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার পথে মূল প্রতিবন্ধক। ভারতবর্ষে ১ হাজার বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকা ইসলামি শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা আমাদের ওপর শরয়ি ফরজ।

কাজেই ভারতে এবং বাংলাদেশে মুজাহিদদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু হবে নিম্নরূপ (আর জিহাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র অঞ্চল হিশেবে বিবেচনা না করে ভারতের একটি প্রদেশ হিশেবে বিবেচনা করাই সংগত। এই দেশের জিহাদের ভাগ্য আঞ্চলিক সাপের মাথা ভারতের পরাজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মুজাহিদদের এখন একটাই লক্ষ্য—গাজওয়াতুল হিন্দ। যে যুদ্ধ বিস্তৃত হবে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিয়ানমার এবং খোরাসান জুড়ে।) :

১. ভারতের ওই সব রাষ্ট্রীয় সংস্থা, যেগুলো ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর থেকে মুসলিম নিধনের কৌশলকে অব্যাহত রেখেছে। বিশেষভাবে ভারতের পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নেতৃত্ব।

২. কট্টর হিন্দুপন্থী সংস্থাগুলোর ওই সব নেতারা, যারা মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া, মুসলমানদের হত্যা করা, তাদের সম্পদ ধ্বংস করা এবং মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর কাজে জড়িত।

৩. ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর ওই সব অফিসারেরা, যাদের হাত আমাদের কাশমিরি ভাইদের রক্তে রঞ্জিত।

৪. রাসুল ﷺ-এর অবমাননাকারীরা।

বার্মায় মুসলমানদের ওপর নির্যাতনকারী সশস্ত্রবাহিনী এবং সশস্ত্র বৌদ্ধ গ্রুপগুলো আমাদের লক্ষ্যবস্তু; যার উদ্দেশ্য :

- বার্মায় মাজলুম মুসলমানদের সাহায্য এবং তাঁদের প্রতিরক্ষা করা।
- বার্মায় জালিম সরকারের ওপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া।
- এবং ইসলামি আরাকানকে বার্মার সশস্ত্রবাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা

ভূখণ্ডের কোনো জায়গায় হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর জনসাধারণ, বসতবাড়ি এবং উপাসনালয় আমাদের টার্গেট নয়। এটা এ জন্য যে, আমাদের যুদ্ধ এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সঙ্গে, যারা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করছে; সাধারণ নিরীহ মানুষজনের সঙ্গে নয়।

Scanned by CamScanner

এক. একটি সংশয় নিরসন

একটা বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকা উচিত যে, কাফিরগোষ্ঠীর প্রধান মাথা অ্যামেরিকাকে আক্রমণ করার এই নীতি অন্যান্য অত্যাচারী কাফিরদের বিরুদ্ধে কথা, কাজ কিংবা অস্ত্রের জিহাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। সুতরাং, ককেশাসে আমাদের মুসলমান ভাইদের অধিকার আছে যে, তারা আগ্রাসী রাশিয়া এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। আমাদের কাশমিরের মুসলমান ভাইদের অধিকার আছে যে, তারা সেখানকার অপরাধী হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। আমাদের পূর্ব তুর্কিস্তানের ভাইদেরও সমান অধিকার আছে যে, তারা চীনা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। একইভাবে ফিলিপাইন, বার্মা এবং এমন প্রতিটি ভূমি, যেখানে মুসলমানেরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন—সেখানে তারা সেখানকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন।

এখানে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর একটি ফাতওয়া প্রাসঙ্গিক :

> أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان
>
> সম্ভ্রম ও দীন প্রতিরক্ষায় লড়াই করা সকলের ঐকমত্যে অপরিহার্য। কারণ, যেই আক্রমণকারী শত্রু মুসলমানদের দীন ও দুনিয়া উভয়টি ক্ষতিগ্রস্ত করে, ইমান আনার পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় কোনো অপরিহার্য বিষয় নেই। তাই তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নেই; বরং সাধ্যমতো তাদের প্রতিহত করা হবে।[৩]

একজন মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে নির্যাতিত হতে দেখেও নির্লিপ্ততা অবলম্বন করবে—এটা কখনোই ভাবা যায় না। মুসলমান তো সেই জাতি, যারা একজন নারীর মর্যাদাহানি হতে দেখে কুফফারের বিরুদ্ধে নাঙা তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই উম্মাহর সবচেয়ে বড় জালিম হিশেবে খ্যাত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো একজন ব্যক্তিও মাজলুম নারীর আর্তনাদকে উপেক্ষা করতে পারেনি। সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে তিন-তিনটি বাহিনী পাঠিয়ে রাজা দাহিরের বন্দিশালা থেকে মাজলুমদের মুক্ত করেছে এবং সিন্ধু পর্যন্ত ইসলামের শুভ্র নিশান উড়িয়েছে। সকল মুসলমান এক দেহের মতো। দেহের কোনো অঙ্গ আক্রান্ত হলে গোটা দেহই তার সঙ্গে ব্যথা

---

৩ *আল-ফাতাওয়াল মিসরিয়্যাহ* : ৪/৫০৮।

Scanned by CamScanner

ও বিনিদ্রায় শরিক থাকে। প্রতিরোধ-প্রচেষ্টায় নিজের জন্মদাত্রী মা এবং অজানা-অপরিচিতা আরেকজন মুসলিম মায়ের মধ্যে পার্থক্য না-করাই ইসলামের শিক্ষা। রাসুল ﷺ বলেন,

> مَا مِنَ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ
>
> যে ব্যক্তি এমন স্থানে অপর মুসলিমের সাহায্য পরিত্যাগ করে, যেখানে তার সম্ভ্রম-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করা থেকে বিমুখ থাকবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য কামনা করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্ভ্রম-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার স্থানে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য প্রত্যাশা করে।[৪]

একজন মুসলমান তার ভাইকে বিপদাক্রান্ত দেখে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কখনোই তার সাহায্য পরিত্যাগ করতে পারে না। হাদিসে এসেছে,

> لَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ أَحَدٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ
>
> তোমাদের কেউ যেন এমন জায়গায় অবস্থান না করে, যেখানে কোনো ব্যক্তিকে জুলুমবশত হত্যা করা হয়। কারণ, যারা সেখানে উপস্থিত থেকেও তার প্রতিরোধ না-করে, তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। তোমাদের কেউ যেন এমন জায়গায় অবস্থান না করে, যেখানে কোনো ব্যক্তিকে জুলুমবশত প্রহার করা হয়। কারণ, যারা সেখানে উপস্থিত থেকেও তার প্রতিরোধ না-করে, তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়।[৫]
>
> الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ

---

৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮৮৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৩৬৮

৫ *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১১৬৭৫

Scanned by CamScanner

اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ

মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে নিজে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে—তার সহযোগিতা পরিত্যাগ করবে না।)[৬] যে-কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে-কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।[৭]

মুসলমানরা যদি আল্লাহর কোনো বান্দাকে মাজলুম হতে দেখেও জালিমকে প্রতিহত না-করে, তাহলে আল্লাহ তাদের সকলকে আজাবে আক্রান্ত করবেন। মাজলুমের সহায়তা পরিত্যাগ করার দ্বারা তারা নিজেরাও জালিম বলে বিবেচিত হবে। হাদিসে এসেছে,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

মানুষ যদি কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দু-হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা অতি শীঘ্রই তাদের সকলকে তাঁর ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন।[৮]

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের সম্বোধন করে বলেন,

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴾

তোমাদের জন্য এর কী বৈধতা আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, যারা দুআ করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জনপদ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিন, এখানকার অধিবাসীরা জালিম এবং আমাদের জন্য

---

৬ *সহিহ মুসলিম* : ২৫৬৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ২০২৭৮

৭ *সহিহ বুখারি* : ২৪৪২

৮ *সুনানুত তিরমিজি* : ২১৬৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৩৩৮

Scanned by CamScanner

আপনার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দিন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দিন।’ [সূরা নিসা : ৭৫]

মাজলুমের দুআ সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। কোনো কিছুই তার সামনে অন্তরায় হয় না। এমনকি সে যদি পাপাচারীও হয়, তবুও আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন। মাজলুমের দুআ শুধু জালিমের ওপরই পতিত হয় না; বরং যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের সহযোগিতা থেকে বিমুখ থাকে, তাদের ওপরও পতিত হয়। রাসুল ﷺ বলেন,

اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।[৯]

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ

মাজলুমের দুআয় সাড়া দেওয়া হয়। এমনকি যদি সে পাপাচারী হয়, তাহলে তার পাপাচার তার নিজের ওপর আপতিত হবে। (কিন্তু সর্বাবস্থায় তার দুআ কবুল করা হবে)।[১০]

আমরা যদি আমাদের নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, আমাদের সামনে দুটো অপরিহার্য বিষয় দেখা দিয়েছে :

১. নিজেদের দেশ হিশেবে আশৈশব আমরা যেই ভূখণ্ডকে চিনে আসছি, যার মধ্যে আমাদের বেড়ে ওঠা এবং যার সঙ্গে আমাদের অসংখ্য স্মৃতি জড়িত, সেই ভূমিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা।

২. পার্শ্ববর্তী দেশ—জাতীয়তাবাদের বিভক্তি ও সীমান্তের কাঁটাতার যদিও তা আমাদের থেকে আলাদা করে রেখেছে; কিন্তু আমরা যখন ইসলামি আকিদায় বিশ্বাসী হব, তখন আমাদের বিশ্বাস এটাই হবে যে, পৃথিবী আল্লাহর। সুতরাং চীন আমাদের। ভারত আমাদের। আরব আমাদের। পাশ্চাত্য আমাদের। গোটা পৃথিবীটাই আমাদের। কারণ, এ সবকিছুর অধিকারী একমাত্র তিনি। আর আমরা তাঁর বান্দা। তো পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে মুসলিমরা যখন জালিম কুফফার কর্তৃক আক্রান্ত হবে, তখন এই আগ্রাসী

---

৯ *সহিহ বুখারি* : ২৪৪৮

১০ *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৭৯৫।

Scanned by CamScanner

শত্রুর প্রতিরোধ করে মাজলুম মানবতাকে সাহায্য করা ঈমান আনার পর আমাদের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

মনে রাখতে হবে, আমাদের লড়াই মূলত কুফরের ইমামদের বিপক্ষে। আমরা কুরআনের নির্দেশ ও নববি মানহাজের অনুসরণে 'সাপের মাথা' যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কুফরিশক্তির কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসমূহের বিপক্ষে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছি। কারণ, আমরা প্রথমে কুফরের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাই, যাতে করে তারা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কোনোদিনও পিঠ সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু তাই বলে আমাদের জন্য নিকটবর্তী মাজলুম উম্মাহর সহযোগিতা পরিত্যাগ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। নিশ্চয়ই আরাকান ও আসামের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হব। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভারত ও মিয়ানমার নামক জালিম রাষ্ট্রপক্ষের জুলুম প্রতিহত না করে আমরা নিজেরাও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছি। এভাবে আমরা ক্রমশ আল্লাহর সাহায্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমরা পৃথিবীতে তার প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলছি। কারণ, আমাদের নির্লিপ্ততা দেখে মাজলুমের বুক ফেঁটে যে আর্তনাদ বের হচ্ছে, নিশ্চয়ই তা সরাসরি রহমানের আরশকেও কাঁপিয়ে তুলছে।

আমরা ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠার অজুহাতে উম্মাহর সাহায্য থেকে যদি নিজেদের হাত গুটিয়ে নিই, তবে কি আমরা আগামীতে কবরস্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব? দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তো উম্মাহর জন্য। উম্মাহর অস্তিত্বই যদি পৃথিবীতে অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠিত দীনের উপকারিতাই-বা কে ভোগ করবে? আমরা তো এখানে বসে এখনো প্রস্তুতির ধাপই অতিক্রম করতে পারছি না; কিন্তু চারিদিকে উম্মাহ আজ ক্ষতবিক্ষত। ধর্ষিতা নারীর কাতর চিৎকারে আকাশও যেন বিদীর্ণ হতে চলেছে। অপরদিকে প্রতিনিয়ত জালিমের প্রাসাদ থেকে গগনবিদারী হাসির হররা ছুটছে। আমাদের চতুর্দিকই ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়, যেদিন সরাসরি আমরাও আক্রান্ত হব। আমরা মাজলুমের সাহায্য পরিত্যাগ করলে আল্লাহও আমাদের সাহায্য পরিত্যাগ করবেন—এটা তাঁর ঘোষণা। আজ তাদের আর্তনাদে যদি আমাদের বুক না কাঁপে, কাল আমাদের আর্তনাদেও কারও বুক কাঁপবে না।

কৌশলগত বিবেচনায়ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের জালিমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা সশস্ত্র ইসলামি আন্দোলনগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একটি সশস্ত্র

Scanned by CamScanner

গেরিলা আন্দোলন তখনই সফলতার মুখ দেখে, যখন তার পেছনে জনসমর্থন থাকে। এসব দেশে প্রস্তুতিপর্বে বা দাওয়াহ প্রসঙ্গে আমরা যখন আমাদের লক্ষ্য মানুষের সামনে স্পষ্ট করতে চাই, তখন অনেক সময় তা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বিরুদ্ধবাদীদের উপর্যুপরি প্রচারণা এবং অনেক অবুঝ জ্ঞানীগুণীর বিভ্রান্তিকর কথাবার্তার কারণে মানুষের সামনে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়ে যায়। যার কারণে অনেকেই মানহাজ গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মাজলুম মানবতার সাহায্য, হৃত গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং আগ্রাসী শত্রুর প্রতিরোধ এমন বিষয়, যে ব্যাপারে সচেতন কোনো মুসলিমের ভিন্নমত নেই। সুতরাং এই সুযোগ কাজে লাগালে জনসমর্থন আদায় ও জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা অনন্য নজির স্থাপন করত। উম্মাহর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া জিহাদি চেতনা পুনরায় জেগে উঠত। উপরন্তু এর দ্বারা মুসলমানদের 'সেইফ জোন'ও তৈরি হতো। আল্লাহ চাইলে স্বল্প পরিসরের ইমারাতও হয়তো উম্মাহ পেয়ে যেত, যেখানে শরিয়ার বিধিবিধান শতভাগ প্রতিষ্ঠিত থাকত।

নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন; কিন্তু তিনি আমাদের হাতে তাদেরকে সেই শাস্তি দেবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾

> তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের অপদস্থ করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করবেন; আর তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের অন্তর প্রশান্ত করবেন। [সূরা তাওবা : ১৪]

আমাদের কাজ শুধু চেষ্টা করা। হাদিসের ঘোষণা অনুসারে আমরা আল্লাহর দিকে একহাত অগ্রসর হলে তিনি আমাদের দিকে দু-হাত অগ্রসর হবেন। আমরা তাঁর দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হলে তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে দৌড়ে অগ্রসর হবেন। আমাদেরকে শুরু করার জন্য আদেশ করা হয়েছে; বিজয়ী হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়নি। আমরা চাইলেই বিজয়ী হতে পারব না। বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কিন্তু নিজেদের সাধ্যে যা আছে, আমরা যদি তা ব্যয় না করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না এবং তিনি এমন অকর্মণ্য বান্দাদেরকে তাঁর দীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন না।

ভুলে গেলে চলবে না, ইসলাম জিন্দা হয় হিজরত ও নুসরতের দ্বারা। আমরা যদি মুহাজির হতে পারি এবং এই মাজলুম মুসলমানরাও সাধ্যমতো আমাদের নুসরত করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ এসব অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতে খুব বেশি সময়

Scanned by CamScanner

লাগবে না। তথাপি এই মাজলুমদের মধ্য হতে মুজাহিদ ও আনসার তৈরি করে নিতেও খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। কারণ, তাদের গায়ে এখনো লেগে রয়েছে রক্তের দাগ। জালিমের লকলকে জিহ্বা ও হিংস্র নখর তাদের চোখের সামনে এখনো জ্বলজ্বল করে জ্বলে। তাদের রক্তে প্রতিনিয়ত আগুন জ্বলে। শাহাদাতের অদম্য বাসনা ও প্রতিশোধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাদেরকে প্রতিমুহূর্তে তাড়িত করে। তাদের দু-চোখে নিরাপদ ও সুন্দর এক পৃথিবীর স্বপ্ন ভাসে। আজ এই মাজলুম মুসলমানদের দুর্দিনে মুসলিম মুজাহিদরা যদি তাদের পাশে না দাঁড়ায়, তাহলে ইতিহাস কখনোই তাদের ক্ষমা করবে না। সাধারণ মানুষজনও মুজাহিদদের ব্যাপারে খুব বেশি সুধারণা রাখতে পারবে না। সুতরাং এখনই সময় জেগে ওঠার। নিজেদের ভোতা বিবেককে জাগ্রত করার। দাওয়াহ, ই'দাদ ও রিবাতের পাশাপাশি সরাসরি কিতালে অবতীর্ণ হওয়ার। জালিমকে তার উপযুক্ত প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে ধর্ষিতা নারী, সন্তানহারা মা, স্বামীহারা স্ত্রী ও নিষ্পাপ ইয়াতিম শিশুদের মুখে হাসি ফুটানোর।

দুই. দীন কায়েমের সরল পথ

পৃথিবীব্যাপী জিহাদের ক্ষেত্রে প্রথমে একটি অগ্রগামী দল তৈরি করতে হবে, যাদের কাজ হবে 'সাপের মাথা' তথা বৈশ্বিক কুফরিশক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ করা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে; কিংবা যেসব সশস্ত্র জিহাদি জামাআত আছে, তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। এই সব দলকে বিশ্বব্যাপী একটি গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে একীভূত করতে হবে। এই আঞ্চলিক দলগুলো নিজ নিজ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবে। দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবে। মুসলিম উম্মাহর হারানো চেতনা জাগ্রত করবে এবং সবাইকে জিহাদের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে। মূল গেরিলাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তারা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পপুলার সাপোর্ট বেস তৈরি করবে।

এরপর ক্ষেত্রবিশেষ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তারা ভূমি দখল করবে এবং সেখানে শরিয়া প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিটি শাখা মূল নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা মেনে চলবে। প্রয়োজনে অন্যান্য ইসলামি দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি দাওয়াতের কাজও চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে আঞ্চলিক তাগুত বা কুফফারকে যথেষ্ট দুর্বল করতে পারলে এবং পর্যাপ্ত ভূমি নিয়ন্ত্রণে আসলে ইমারাহ গঠন করবে।

Scanned by CamScanner

একই সঙ্গে মূল শত্রু বৈশ্বিক কুফরিশক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। একটি শক্তিক্ষয়ের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে (Asymmetric war of attrition) কুফরের ধ্বজাধারী ও দাজ্জালি মিশন বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রসমূহকে জড়িয়ে রাখতে হবে। এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা নিঃশেষ করার মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বে সেসব রাষ্ট্রের সামরিক অভিযান চালানোর সক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে হবে।

এভাবে যখন বৈশ্বিক কুফরিশক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলো মুসলিমবিশ্বে আগ্রাসন চালাতে এবং সামরিকভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের তাগুতগোষ্ঠীকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে দাঁড়াবে, তখন শুরার মাধ্যমে, উম্মাহর আন্তরিক সন্তুষ্টি ও সম্মতির ভিত্তিতে খিলাফাহ ঘোষণা করা হবে।

এটা হলো দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোনো আঞ্চলিক ভূমি দখল করাই মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং আঞ্চলিক সংঘর্ষের চেয়ে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যসমূহই এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে এখানে আঞ্চলিক তাগুতের আগে কুফরের ইমামদের ধ্বংস করাই মূল উদ্দেশ্য হিশেবে বিবেচিত হয় এবং এর জন্য জনসমর্থনের ভিত্তিতে গেরিলাযুদ্ধকেই উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পন্থা মনে করা হয়।

খিলাফাহ ঘোষণা করার পর শরিয়ার নির্দেশনা অনুসারে খলিফাকে আবশ্যিকভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে—সকল মুসলিমের হিজরতের জন্য খিলাফাহর ভূমিকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দিতে হবে। ভাষা-বর্ণ-মতাদর্শ নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মুসলিমের জন্যই এই সুযোগ থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সকল নির্যাতিত মুসলিমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো একই সঙ্গে সকল জায়গায় সাহায্য পাঠানো সম্ভব হবে না, এতদ্‌সত্ত্বেও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে অবশ্যই পাঠাতে হবে। আর যে অঞ্চলগুলোতে সেনা পাঠানো যাবে না, সেখানকার মুসলমানদের অর্থ, লোকবল এবং অস্ত্র দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তো যতদিন পর্যন্ত খিলাফাহর এসব দাবি পূরণ করার মতো সামর্থ্য অর্জিত হবে না, ততদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে ইমারাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। শর্ত পূরণ না করেই তাড়াহুড়ার ভিত্তিতে খলিফা সেজে বসবে না। কারণ, খলিফা হওয়ার অর্থ হলো গোটা মুসলিমবিশ্বের অভিভাবকত্বের আসনে আসীন হওয়া। সকল মুসলিমের দায় ও কর্তৃত্ব লাভ করা।

Scanned by CamScanner

তবে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জনগণ হলো পানি, যার মধ্যে গেরিলারূপী মাছ সাঁতরে বেড়ায়। সুতরাং জনসমর্থন ব্যতীত মুজাহিদদের অবস্থা হবে পানি ছাড়া মাছের মতো, যার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ জন্য সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি জনসমর্থন তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে তা সামরিক সক্ষমতার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রথমে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এরপর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বা আদর্শিক ঐক্য গঠন করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত সম্মুখযুদ্ধ ও শত্রুর ধ্বংসের দিকে মনোনিবেশ করা হবে। যার কারণে চূড়ান্ত সম্মুখযুদ্ধে যাওয়ার আগে অবশ্যই মুজাহিদদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি জনসমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমে শক্তি, সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে গোপনে নিজেদের প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। বিভিন্ন দলের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততাও গোপন রাখতে হবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মিডিয়াতে প্রচারিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, কোনো ভূখণ্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এলে সেখানে অনতিবিলম্বে শরিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে; কিন্তু ইমারাহ ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট পর্যায়ের স্থিতিশীলতা ও প্রতিরোধশক্তি অর্জিত হওয়ার আগে ইমারাহ ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় কৌশলগত কারণে কখনো সেই ভূমি থেকে মুজাহিদরা পিছু হটলে এবং সেখানে কিছুদিন পর ইমারাহর নাম-গন্ধ না থাকলে জিহাদ ও মুজাহিদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা মন্দ হয়ে যাবে। আর কখনোই এই লড়াইকে কুফফার বনাম নিজেদের দলের লড়াই হিশেবে উপস্থাপন করা যাবে না; বরং এটাকে উপস্থাপন করতে হবে কুফফার বনাম মুসলিম উম্মাহর লড়াই হিশেবে, যাতে করে মুসলমানরা সবাই এটাকে নিজেদের সংগঠন মনে করে; নিজেদের থেকে আলাদা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো দল ভেবে না বসে। এ জন্য জিহাদি আন্দোলনের উচিত, সে শত্রুকে আক্রমণ করা, যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য। সে শত্রুকে নয়, যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক।

তিন. গণতান্ত্রিক পন্থায় কি দীন কায়েম হওয়া সম্ভব

গণতান্ত্রিক পন্থায় কখনোই দীন কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি এসব দেশের ইসলামপন্থী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে এর বাস্তবতা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Scanned by CamScanner

১. সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম এক জাতি। দেশভিত্তিক জাতীয়তা ইসলামসম্মত নয়। যার কারণে মুসলমানদের নিয়ে ভাবলে গোটা মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে ভাবা উচিত। শুধু নিজ দেশের মুসলিমদের নিয়ে ভাবা ও বাকি সবাইকে ভুলে থাকা জাতীয়তাবাদী মানসিকতার পরিচায়ক। যেহেতু গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে জনগণই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস, তাই গণতান্ত্রিকরা এই উৎস থেকে ক্ষমতা আহরণ করতে চায়। এরপর সেই রাষ্ট্রের জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়।

২. গোটা পৃথিবী এখন একটা গ্রামের মতো। এ ক্ষেত্রে 'গ্লোবাল ভিলেজ' শব্দটা বেশ পরিচিত। পুরো পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। যুগের হোবল অ্যামেরিকা এই পৃথিবীর প্রভু সেজে আছে। চীন, ভারতসহ আরও কিছু রাষ্ট্র নির্দিষ্ট পরিসরে 'সাপের মাথা'র ভূমিকা পালন করছে। এমতাবস্থায় আলাদাভাবে পৃথিবীর কোনো একটা দেশের মধ্যে নিজেদের কর্মপরিকল্পনা সীমাবদ্ধ রাখা অতীতের চেয়েও অধিক নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ, এই অবস্থায় নির্দিষ্ট একটা সীমা ও সীমানার বাইরে দীন কায়েম করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মুরসি বা জিয়াউল হকরা এই সীমা অতিক্রম করতে গেলে তাঁদেরকে আর বাঁচতে দেওয়া হয় না। এরদোগানরাও যতটুকু করেছে, এর বাইরে খুব বেশিদূর যাওয়া তাঁদের জন্য সম্ভব নয়। এ যুগে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে উন্নতি করা নয়; বরং পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল লাগিয়ে নেওয়া।

৩. রাষ্ট্রে বিভিন্ন হারাম কাজের সয়লাব দেখা যায়; কিন্তু সমস্যার মূল তো হলো একেবারে গোড়ায়। ইসলামপন্থী গণতান্ত্রিকরা দিবাস্বপ্নের মতো করে কখনো যদি ক্ষমতা পেয়েও যায়, তারা কি পারবে সিস্টেমকে আমূল পরিবর্তন করতে? তারা কি পারবে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত চার কুফরি মূলনীতি রদবদল করতে? তারা কি পারবে 'হাকিমিয়্যাহ' একমাত্র আল্লাহকে দিতে? তারা কি পারবে কুরআন ও সুন্নাহর বিচারব্যবস্থা জারি করতে? তারা কি পারবে সর্বস্তরের জনগণের সমমর্যাদা দূর করে মুমিনদের সঙ্গে 'আল-ওয়ালা' এবং কুফফারের সঙ্গে 'আল-বারা' কায়েম করতে? তারা কি পারবে 'কুফর বিত তাগুত' তথা আন্তর্জাতিক তাগুতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করতে? তারা কি পারবে ই'দাদ এবং আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক কিতালের মাজলুম ফরজ ফিরিয়ে আনতে? তারা কি পারবে পার্শ্ববর্তী মাজলুম মুসলমান জাতিগোষ্ঠীর প্রতি প্রকাশ্য সহযোগিতা দিতে?

Scanned by CamScanner

তারা কি পারবে মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বাস্তবায়িত করতে? তারা কি পারবে বিচারালয় ও মন্ত্রণালয় পুরোপুরি আলিম ও ফকিহদের দ্বারা পরিচালিত করতে? তারা কি পারবে কুরআনকে টেনেটুনে যুগের অনুগামী না করে যুগকে কুরআনের অনুগামী করতে? দেশে দেশে তাদের বাপ-দাদারা কোনোকালে পেরেছে কি? আধুনিক গণতন্ত্রের উত্থানের পরে তাদের তত্ত্ব কখনো কোথাও বাস্তবতার চেহারা দেখেছে কি?

৪. কোনো ইসলামপন্থী সরকার গণতান্ত্রিক পন্থায় নিজ দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বাস্তবায়িত করলে সাপের মাথারা কি বসে বসে আঙুল চুষবে? তারা তো কোনোভাবেই এই সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে দেবে না। এমনকি সরকারপ্রধান গুপ্তহত্যা বা গুমের শিকার হওয়ার শঙ্কাও একেবারে অমূলক নয়। ইতিহাসে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর সাধারণ জনগণ সবাই যদি তাদের সাপোর্টও দেয়—যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে এটা অসম্ভব, তারপরও গোটা দেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবরোধের পরিণাম কী হবে? এরকম জনভূমি-পরিবেষ্টিত দেশে লাগাতার বোমা হামলা ও আকাশপথ থেকে বর্ষিত বিস্ফোরকের নির্মম আঘাতে এটা কি আরেক সিরিয়ায় পরিণত হবে না? অ্যামেরিকা বা ভারতের ওয়ার অন টেররের মোকাবিলা করার সদিচ্ছা বা শক্তি কোনোটিই কি এদের আছে? এরা শাপলা চত্বরেই গোটা জাতিকে অজানা ভবিষ্যতের সামনে ফেলে শিয়ালের মতো রাতের আঁধারে আত্মগোপনের চাদর গায়ে জড়াতে পারে। সারাজীবন কিতালের বিরোধিতা করে শেষাবধি এরাই কিতালের পথে হাঁটবে—এটা ভাবলেও তো খিলখিলিয়ে হাসি পায়। আদৌ কি তা সম্ভব? ই'দাদ বর্জনকারী ও তাগুতকে অদৃশ্য বায়আত প্রদানকারী জাতি কিতাল করবে বিশ্বের পরাশক্তিদের বিপক্ষে—এটাও কি কোনোদিন বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?

৫. গণতান্ত্রিকরা মূল কুফরগুলোকে আপন অবস্থায় রেখে যদি শাখাগত কিছু সংশোধনের কাজ চালায় এবং এভাবেই জীবন কাটায়, তাহলে এটা কখনোই ইসলামি ইমারাহ হিশেবে বিবেচিত হবে না। গাছের শিকড় উৎপাটিত অবস্থায় রেখে ডালে ডালে পানি সিঞ্চন করে ফল-ফুলের আশা করা বোকামি বৈ কী! এ তো কেমন যেন সোনার হরিণ বা আলেয়ার আলোর মতো। আর তারা যদি গণঅভ্যুত্থান/গণবিপ্লব ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ

Scanned by CamScanner

ইসলাম কায়েমের ঘোষণা দিয়েই বসে; আর সরকারি বাহিনীগুলোকে মুজাহিদবাহিনীতে রূপান্তরিত করে ফেলে, তাহলে দেশে সৃষ্টি হবে যুদ্ধবিগ্রহের পরিস্থিতি। কৌশলে গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর আশঙ্কাও ফেলে দেওয়া যায় না। গুপ্তহত্যা, গুম, খুন, গ্রেফতার ইত্যাদি তো আছেই।

ইসলাম এসেছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। বহির্বিশ্বের চাপ ও উপর্যুপরি আক্রমণের কারণে অকস্মাৎ দেশ চলে যাবে এমন অশান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মুখে, যা সামাল দেওয়ার শক্তি তাদের নেই। উপরন্তু এখানকার মুসলমানদের কোনো 'সেইফ জোন' না থাকায় তাদের প্রাণহানির আশঙ্কাই প্রবল। তিন দিকে ভারত, আর একদিকে বঙ্গোপসাগর রেখে তবে কি কবরস্থানে ইসলাম কায়েম করা হবে?

আফগান ছিল সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থান; আর এটা কি হবে বাংলাদেশি মুসলিমদের সমাধিস্থান? উপরন্তু দেশের সশস্ত্র বাহিনী বা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো তো দাদাদের অদৃশ্য ইশারায় পরিচালিত হয়। এরা আপনার পক্ষ হয়ে কিতালে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এটা আপনি কীভাবে ভাবলেন? যেহেতু এদের মানসজগৎ ইসলামের আদলে গড়ে ওঠেনি, তাই প্রথমে এরাই অন্যদের ইঙ্গিতে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, আপনার ওপর তাদের জমানো শক্তি প্রয়োগ করবে—বাহ্যদৃষ্টিতে এর সম্ভাবনাই প্রবল। তো সে সময় আপনারা কি সরকারি বাসভবন ছেড়ে কোনো প্রকার পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া রাতারাতি গেরিলা কমান্ডো-বাহিনীতে রূপান্তরিত হবেন? এরপর ক্ষমতা দখলকারী শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল করবেন?

৬. একটা খিলাফাহ-রাষ্ট্রের কথা বাদই দিলাম, একটা ইমারাহরাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হয় এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় তা কীভাবে সম্ভব—এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এসকল গণতান্ত্রিকদের কাছ থেকে কখনো মেলে না। হয়তো-বা তারা নিজেরাও এর সম্ভাব্যতা ও রূপরেখা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তথাপি খিলাফাহ ও ইমারাহর পার্থক্যই কয়জনের গোচরে রয়েছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

Scanned by CamScanner

নিষ্ক্রিয় সমর্থক যখন ‘মানহাজি ভাই’

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴾

হে ওই সকল লোকেরা, যারা ইমান এনেছ তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর। [সুরা সাফ : ২-৪]

﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ করো আর নিজেদেরকে ভুলে যাও; অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো। তোমরা কি বিবেক খাটাবে না? [সুরা বাকারা : ৪৪]

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদের এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ-না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে। আর তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। [সুরা তাওবা : ১৬]

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا۟

Scanned by CamScanner

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾

আপনি কি সেসব লোককে দেখেননি, যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখো, সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো? তারপর যখন তাদের প্রতি কিতালের নির্দেশ দেওয়া হলো, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে; এমনকি তারচেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের ওপর কিতাল ফরজ করলে! আমাদের কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না! তাদের বলে দিন, পৃথিবীর ভোগ্যসামগ্রী স্বল্প। আর আখিরাত পরহেজগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। [সুরা নিসা : ৭৭]

গত বেশ কয়েক বছরে তাওহিদ ও জিহাদের দাওয়াত সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে অনেকটুকু ছড়িয়ে পড়েছে। যে প্রজন্মের আগে সময় কাটত জাহিলিয়াতের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে, আজ তাদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের কাছে এসব কিছু ছাপিয়ে জিহাদের ডাক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যারা আগে নিজেদের সালাত নিয়েই চিন্তা করত না, আজ উম্মাহর রক্তের নদী দেখে তাদের হৃদয় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। কুফফার ও তাগুতগোষ্ঠী যতই জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, যতই জিহাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছে, যতই জিহাদের ডাককে চাপা দিতে চাচ্ছে, ততই এ ডাক আরও ছড়িয়ে পড়ছে। ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নিজ কর্ম সম্পাদনে প্রবল থাকেন, যদিও অধিকাংশ লোকেরাই তা জানে না।’ [সুরা ইউসুফ : ১২:২১]

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়; কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [সুরা তাওবা : ৩২]

তবে চিরাচরিত সত্য হলো, একটি কাজ যখন শুরু হয় তখন মান নিয়ন্ত্রণ করা যতটুকু সহজ হয়, কাজের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা আর ততটা সহজ থাকে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে এটা সাধারণভাবে সত্য। একথা অনলাইননির্ভর

Scanned by CamScanner

দাওয়াত ও দায়িদের ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা যদি অনলাইনে জিহাদের দাওয়াত এবং দায়িদের দিকে তাকাই, তাহলে এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে মানহাজের দাওয়াত আমরা করছি, যে মানহাজের অনুসরণ আমাদের দ্বারা হচ্ছে, তার শর্ত, বৈশিষ্ট্য এবং দাবিগুলো সম্পর্কে দেখা যায় অনেক ভাই-ই ওয়াকিবহাল নন।

যেমন, আজকাল একটি কথা খুব বেশি শোনা যায়—'মানহাজের ভাই' বা 'অমুক আমাদের মানহাজের'। এ ধরনের কথা দ্বারা বোঝানো হয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জিহাদের মানহাজের অনুসারী। মুসলিম হিশেবে আমাদের মুসলিম পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকাই যথেষ্ট। ব্যাপকভাবে এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। এক মুসলিমের সম্পদ, রক্ত ও সম্মানকে তার মুসলিম ভাই হেফাজত করবে। পরিচয় হিশেবে এটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। সেখানে আলাদা করে 'মানহাজের ভাই' বা এ ধরনের শব্দাবলির প্রয়োগ কতটা যৌক্তিক, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ।[১১] তার ওপর এ ধরনের শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়

---

১১ 'মানহাজি ভাই' এবং 'প্র্যাক্টিসিং মুসলিম' : দুটো অভিনব পরিভাষা। প্র্যাক্টিসিং মুসলিম—বাংলায় বললে ইসলাম চর্চাকারী। সাধারণত যারা অন্ধকার পথ ছেড়ে নতুন করে দীনের ওপর চলতে শুরু করেন, তারা বোধ হয় এ শব্দটি বেশি ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও জেনারেল শিক্ষিত অনেক ভাইকেই এ শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। 'আমি একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম'—এ কথাটি এখন অনেকেই উচ্চারণ করেন।

'প্র্যাক্টিসিং মুসলিম' শব্দটি নিজের ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায়, অন্যের ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায়। সাধারণত যারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মানার চেষ্টা করে—নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, জাকাত দেয়, সামর্থ্য হলে হজও করে তাদের প্র্যাক্টিসিং মুসলিম বলা হয়। কেউ হয়তো এর সঙ্গে পুরুষের ক্ষেত্রে দাড়ি এবং নারীর ক্ষেত্রে পর্দাকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। অবশ্য বিষয়টা যৌক্তিকও বটে। কারণ, যে পুরুষের দাড়ি নেই কিংবা যে নারী পর্দা করে না, তারা হলো ফাসিক। ফাসিক পুরুষ ইমামতি করলে মুক্তাদিগণের নামাজ পর্যন্ত মাকরুহ হয়ে যায়। সুতরাং যে তার ব্যক্তিগত জীবনে ফাসিক, তাকে প্র্যাক্টিসিং মুসলিম বলে অভিহিত করা কিছুটা হাস্যকরও বটে।

যা-হোক, আমাদের কথা এ নিয়ে নয়। আমাদের কথা হলো, ইসলাম কাকে বলে? ইসলাম মানে কি শুধু নামাজ আর রোজা, হজ আর জাকাত, দাড়ি আর পর্দা ইত্যাদি ইত্যাদি? নাকি ইসলাম এর চাইতেও বিস্তৃত কিছু? প্রচলিত ইবাদতগুলো নিঃসন্দেহে দীনের রুহ—এ কথা নির্দ্বিধ স্বীকার্য। কিন্তু এই ইবাদতগুলোই সবকিছু নয়; বরং ইসলামের রয়েছে আরও বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা। নিরেট ইবাদত গোটা দীনের কত শতাংশ? ইসলামের বিধান তো শুধু ব্যক্তিজীবনের উপাসনার সঙ্গে বিশেষায়িত নয়। ইসলামের বিধান রয়েছে পরিবারে, ইসলামের বিধান রয়েছে সমাজে, ইসলামের বিধান রয়েছে রাষ্ট্রে, ইসলামের বিধান রয়েছে রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে-সমরনীতিতে, রাজনীতিতে-পৌরনীতিতে—সবমিলিয়েই ইসলাম।

পৃথিবীতে খিলাফাহ নেই, মুসলিমদের একজন খলিফা নেই, ইসলামের ভূমি বিশ্ব কুফরিশক্তির দখলে। এ অবস্থায় খিলাফাহ-খলিফা-দারুল ইসলাম উদ্ধার করার প্রচেষ্টায় নিজেকে অংশগ্রহণ না করে শুধু তাসবিহ টেপা হলেই কি নিজেকে প্র্যাক্টিসিং মুসলিম ভাবার সুযোগ রয়েছে? মাজলুম মানবতার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা, জালিমের হাতকে ভেঙে দেওয়া ইসলামের বিধান। এ বিধান পালনের জন্য কার কী প্রচেষ্টা! আমরা তো প্রতিবেশী রোহিঙ্গাদের মধ্যেও মাত্র দুদিন ত্রাণ নিয়ে গিয়েই তৃপ্তির ঢেকুর

Scanned by CamScanner

তুলি, পাঁচ দিন খেদমত করে ঝিমিয়ে পড়ি; কিন্তু কেউই স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটি না, স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হই না। আমরা শান্তি চাই; কিন্তু স্থায়ী শান্তির জন্য, স্থায়ী উপশমের জন্য সাময়িক অপারেশনকে হাসিমুখে বরণ করতে পারি না।

ইসলামের সবগুলো ক্ষেত্র, যেগুলো আল্লাহ আমার ওপর অবধারিত করেছেন—যদি আমি সাধ্যমতো অল্পস্বল্প করেও মানার চেষ্টা করি, তখন নাহয় নিজেকে প্র্যাক্টিসিং মুসলিম বলাটা সমীচীন হতে পারে। কাজের হক পূর্ণ করতে না পারি; কিন্তু সাধ্যমতো চেষ্টা তো করি! তবে এমন যদি হয় যে, ইসলামের ১০ শতাংশ নিয়েই আমি সন্তুষ্ট, বাকি ৯০ শতাংশের দিকে আমার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই, তাহলে এ কেমন ইসলামের প্র্যাক্টিস? সবগুলো অঙ্গ মিলিয়েই তো একটা ইসলাম। এ কারণেই তো আজ পুরো দুনিয়ায় কোটি কোটি প্র্যাক্টিসিং মুসলিম; কিন্তু বদরের সেই ৩১৩-এর কারনামার দেখা আজ পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, 'হে ওই সকল লোক, যারা ইমান এনেছ, তোমরা ইসলামে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ করো।' 'গড ভি রাজি রাহে আওর এভিল ভি নারাজ না হো'—ইসলামে এ ধরনের প্র্যাক্টিসের কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম-সমর্থিত বিভিন্ন ধারা-উপধারা কারও জান্নাতের যাত্রাপথে সহায়ক হতে পারে; কিন্তু শুধু তা-ই কাউকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে না। আমি পীরের কাছে বায়আত হয়েছি বলে আমার নামাজ মাফ হয়ে যাবে না। আমি তাবলিগ করি বলে আমার জন্য সকল কুকর্ম বৈধ হয়ে যাবে না। আমি দীন কায়েমের জন্য মিছিল-মিটিং, সংস্কৃতিচর্চা করি বলে আমার থেকে শরিয়ার অপরিহার্য বিধানগুলো শিথিল হয়ে যাবে না।

ব্যাপকভাবে শরিয়ার ক্ষুদ্র একটা অংশ নিয়ে আমরা সকলে সন্তুষ্ট। সকলেই কেমন যেন আত্মকেন্দ্রিক; অথচ ইসলাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয়। বরং ইসলাম এক সামগ্রিক দীন, গোটা জিন-ইনসানের জন্য এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

পুরো ইসলাম নাহয় বাদ দিলাম, ইসলামের সবগুলো ফরজ বিধানও যদি অল্পস্বল্প করে পালন করতে পারতাম তাহলেও নিজেকে হয়তো প্র্যাক্টিসিং দাবি করার সুযোগ ছিল; কিন্তু ব্যাপকভাবে এই শব্দের ব্যবহারকারীদের জীবনের দিকে লক্ষ করলে বোধ হয় ইসলামের অতি ক্ষুদ্রাংশই পাওয়া যাবে, যা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট।

এ ছাড়াও নিজেই নিজেকে প্র্যাক্টিসিং বলাটা কেমন যেন একধরনের 'তাজকিয়া'। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদের তাজকিয়া করো না।' অর্থাৎ, নিজেরাই নিজেদের সাফাই গেয়ো না; আত্মপ্রশংসা করো না। 'তিনি ভালো জানেন কে আল্লাহভীরু'। [সুরা নাজম : ৩২] হাদিসেও এসেছে, 'তোমরা আল্লাহর ওপর কাউকে পরিশুদ্ধ ঘোষণা করো না।' কারণ, কে ভালো আর কে মন্দ, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

এটাও তখন, যখন পুরো ইসলাম মান্য করা হবে। কারণ, ইসলামের ক্ষুদ্রাংশ মান্য করা হলে আর বৃহদাংশ পরিত্যাগ করা হলে তো নিজের মধ্যে একধরনের অতৃপ্তি-অনুশোচনা কাজ করার কথা। আর যার ভেতরে বাস্তবেই তা কাজ করবে, সে কীভাবে নিজেই নিজেকে 'প্র্যাক্টিসিং মুসলিম' দাবি করতে পারে! প্র্যাক্টিসিং মুসলিমের জন্য ইসলামের অপরিহার্য পুরোটা অংশের প্র্যাক্টিস অবশ্যই জরুরি হওয়ার কথা। হ্যাঁ, আমি প্র্যাক্টিসিং মুসল্লি হতে পারি, প্র্যাক্টিসিং আবিদ (ইবাদতকারী) হতে পারি; কিন্তু প্র্যাক্টিসিং মুসলিম তো তখনই হব, যখন আমার মধ্যে ইসলাম আসবে—আংশিক ইসলাম নয়, পূর্ণ ইসলাম। পূর্ণ দ্বারা সেই অংশ উদ্দেশ্য, যা আমার ওপর অবধারিত। যা আমার ওপর অবধারিত নয়, তার দায় আমার নেই। এ জন্য কোনো গরিব ব্যক্তি হজ না-করেও, জাকাত না-দিয়েও প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হতে পারে—যদি সে তার ওপর ইসলামের অবধারিত বিধানগুলোর চর্চা করে থাকে।

আমরা মুখে অনেক অলীক স্বপ্নের কথা বলি। স্বপ্ন দেখেই ফজিলত হাসিল করে নিতে চাই। স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মধ্যে থাকে ৫০০ মাইল দূরত্ব। আমি মুখে বলতে পারি—আমার তো এই স্বপ্ন, আমার তো

Scanned by CamScanner

সেই স্বপ্ন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো অন্তর্যামী। তিনি বলেন, 'তারা যদি বাস্তবেই বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত তাহলে অবশ্যই তার জন্য কিছু হলেও প্রস্তুতি গ্রহণ করত।'
সুতরাং ইসলামের অবধারিত স্টেপগুলো বাস্তবে পূর্ণ করার আগে নিজের ব্যাপারে বা অন্য কারও ব্যাপারে 'প্র্যাক্টিসিং মুসলিম' শব্দ ব্যবহার করাটা বোধ হয় সংগত হবে না।

মানহাজ মানে ধারা। এর আরও অর্থ রয়েছে। তবে শব্দটা এখন ভার্চুয়ালসমাজে এ অর্থেই অধিক প্রচলিত। যেকোনো ধারাকেই মানহাজ বলা হবে—হোক তা হক; কিংবা বাতিল ধারা। মানহাজগত মতবিরোধ চিরকাল থাকবে। তবে মানহাজগত মতবিরোধ এবং মাজহাবগত মতবিরোধ এককথা নয়। (স্বীকৃত মাজহাবগুলোর) মাজহাবগত মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয়টিই অনুসৃত এবং পালিত। শরিয়াই এই অনুসরণ এবং পালনের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু মানহাজগত মতবিরোধ মানে এ নয় যে, উভয়টিই অনুসরণীয় এবং পালনীয়। কারণ, ইসলামের রয়েছে মূলধারা এবং বিচ্ছিন্ন ধারা। আধিক্য এবং স্মার্টনেস দিয়ে মূলধারা চিহ্নিত হয় না; বরং মূলধারা চিহ্নিতকরণের মাপকাঠি হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং জামাআহ। এই মাপকাঠিতে যা যা উতরে যাবে, তা সঠিক মানহাজের তালিকায় স্থান পাবে। আর এই মাপকাঠিতে যা যা উতরাবে না, তা বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত হবে।
'মানহাজি ভাই' একটা অস্পষ্ট শব্দ। কোন মানহাজ? কীসের মানহাজ? হক মানহাজ না বাতিল মানহাজ? নতুন কেউ কথাটা শুনলে আর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে।
আমরা যে অর্থে শব্দটা প্রয়োগ করে থাকি, (অর্থাৎ কিতালি ধারা) সে অর্থে শব্দটাকে ব্যবহার করা যদিও মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে, কেউ কেউ এর ভিত্তিতেই 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' কায়েম করে ফেলছে। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না।
আপনি এই ধারার অনুসারী—এর অর্থ এটা নয় যে, পৃথিবীর অন্য সকল ধারা বাতিল। হ্যাঁ, 'এটা' এবং 'ওটা' হক হওয়ার অর্থ এ নয় যে, উভয়টি সমস্তরের। স্তরগত এবং মর্যাদাগত তফাতের বিষয়টি সর্বস্বীকৃত। আগেই বলেছি, মানহাজ শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র অসংখ্য। তালিম, তাজকিয়া, দাওয়াহ থেকে শুরু করে ইসলামে রয়েছে অসংখ্য ধারা! দীনের চর্চা হয়ে আসছে বহু যুগ ধরে। দীন হলো গাড়ির মতো, যা চলতে হলে শুধু একটা চাকাই যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন অনেকগুলো চাকা। এখন এক চাকা যদি অন্য চাকার সহযোগী হয় তাহলে গাড়ি এগিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এক শাখা যদি অন্য শাখার প্রতিপক্ষ হয় তাহলে গাড়ি থেমে যাবে বা তার পথচলা কষ্টকর হয়ে যাবে।
দীনি ভ্রাতৃত্বের মাপকাঠি হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর শাশ্বত বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা। যে-কেউ এই বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা লালন করবে, সে মানহাজু আহলিস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং অন্য মুসলিমরা হয়ে যাবে তার পরমপ্রিয় ভাই। সুতরাং মানহাজি ভাই মানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ভাই, দীনি ভাই। বিস্তৃত মানহাজকে সংকীর্ণ মানহাজে পরিণত করার কোনো কারণ নেই। আর যে মানহাজের দিকে নিজেদের নিসবত করে আলাদা সার্কেলের ভাবনা থেকে এই শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, সে মানহাজও সম্ভবত নিজেকে সমাজের অন্যান্য হকপন্থী ধারা থেকে আলাদা করতে চায় না। এবং তা উচিতও নয়, সমর্থনযোগ্যও নয়। এমনকি তার ফলও সুন্দর নয়। হ্যাঁ, 'তাকসিমে কার' হিসেবে একেকজন একেক ফিল্ডের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করবে—তা ভিন্ন কথা। তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সবগুলো মানহাজের মধ্যে ঐক্য থাকবে, ভ্রাতৃত্ব থাকবে, আল-ওয়ালা থাকবে; তাদের মধ্যে অনৈক্য থাকবে না, কোন্দল থাকবে না, কোনো ধরনের আল-বারা থাকবে না। তারা সম্মিলিতভাবে অভ্যন্তরীণ শত্রু, বিদআতি মানহাজের অনুসারীদের বিরুদ্ধে এবং কুফফার-গোষ্ঠীর বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকবে; থাকবে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো।

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে। খোঁজ নিলে দেখা যায়, যাকে বা যাদেরকে 'মানহাজের ভাই' বলা হচ্ছে তিনি বা তারা না-কোনো জিহাদি তানজিমের সঙ্গে যুক্ত; আর না সক্রিয়ভাবে কোনো ধরনের জিহাদি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এবং এই ভাইদের বিশাল একটা অংশকে যখন জিহাদের কাজের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যান। বিশেষ করে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে সেলিব্রিটি হিশেবে এবং 'জিহাদি সেলিব্রিটি, মানহাজের ভাই' হিশেবে পরিচিত তাদের জন্য এটা প্রায় শতভাগ সত্য। তাহলে এ কোন মানহাজের কথা হচ্ছে? যারা এরকম বলে থাকেন তাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণাটা হলো, যে ব্যক্তি জিহাদ ভালোবাসে, গ্লোবাল জিহাদকে সমর্থন করে, যারা ৯/১১-এর পক্ষে কথা বলে, যারা শাতিমে রাসুলদের মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করে, যারা জিহাদকে ফরজ বলে প্রচার করে তারা হলো 'মানহাজের ভাই', তারা হলো আমাদের 'মানহাজের লোক'। কিন্তু আসলে কি মানহাজ বলতে এটাকেই বোঝানো হয়? মানহাজ বলতে কি নিছক কোনো তাত্ত্বিক ও নিষ্ক্রিয় সমর্থনের মনোভাবকে বোঝানো হয়? আর এটা কি বৈশ্বিক জিহাদের মানহাজ?

মানহাজ বলতে আসলে কী বোঝানো হয়? নাতিদীর্ঘ অ্যাকাডেমিক আলোচনায় না গিয়ে সাধারণভাবে বলা যায় মানহাজ হলো কর্মপদ্ধতি। যদিও মানহাজের সবচেয়ে প্রচলিত সংজ্ঞা হলো, মানহাজ হচ্ছে ইলম, গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি। তথাপি একথা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, মানহাজের পরিধি শুধুমাত্র ইলম অর্জন ও বাস্তবায়নের মধ্যে সীমিত ন্য; বরং তা আরও ব্যাপক। আধুনিক সময়ে মানহাজের সর্বাধিক প্রচলিত অর্থ হলো দীন কায়েমের কর্মপদ্ধতি। যেমন ধরুন, কেউ যদি বলে দীন কায়েমের পন্থা হলো দাওয়াত ও তাজকিয়া এবং সে এ বিশ্বাসের ওপর কাজ করে, তবে তার মানহাজ হলো দাওয়াত ও তাজকিয়ার মানহাজ। যেমন, তাবলিগ জামাআত। কেউ যদি বলে দীন প্রতিষ্ঠার উপায় হলো ইসলামি সমাজ

কুফফারের সঙ্গে পূর্ণ আল-বারা থাকবে। যে এর অন্যথা করবে, সে ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করল, সে-ও তাদের একজন হয়ে গেল। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বাইরে যত বিদআতি মানহাজ রয়েছে, এ সবগুলোর সঙ্গেও তাদের বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা অনুপাতে আল-বারা থাকবে। তবে এই কর্মপন্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, বিজ্ঞ এবং সচেতন আলিমগণের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে করে ওয়ালার দাবিদারদের সঙ্গে বারা না হয়ে যায়; একইভাবে বারার দাবিদারদের সঙ্গে মাত্রার চাইতে বেশি ওয়ালা না হয়ে যায়।

'প্র্যাক্টিসিং মুসলিম' এবং 'মানহাজি ভাই' শব্দ দুটোকে যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, এই ব্যবহারকে আমাদের কাছে কেন যেন অসংগত মনে হয়। উপরিউক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে এ বিষয়টিই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

Scanned by CamScanner

বিনির্মাণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া এবং সে এই তত্ত্বের ওপর আমল করে, তবে এটা তার মানহাজ। যেমন, জামায়াতে ইসলামী বা ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড)। কেউ যদি মনে করে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ হলো আসারি আকিদার দাওয়াত দেওয়া এবং সে এই বিশ্বাসের ওপর কাজ করে, তবে সেটাই তার মানহাজ। যেমন, শায়খ আলবানির সালাফি দাওয়াত। কেউ যদি মনে করে উম্মাহর উত্তরণের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তারবিয়াত, তালিম ও দাওয়াহ এবং সে এই বিশ্বাসের ওপর আমল করে, তবে সেটাই তার মানহাজ।

এখানে লক্ষণীয়, মানহাজ সরাসরি আমলের সঙ্গে, বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয়। নিছক সমর্থন বা সহমর্মিতার সঙ্গে না। এ কারণে স্রেফ সমর্থনের সঙ্গে মানহাজের যোগসূত্র খোঁজা হাস্যকর। নির্দিষ্ট কোনো একটি আদর্শ ধারণ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি মানহাজের অনুসরণ সম্ভব। তবে জিহাদের ক্ষেত্রে যখন এটা বলা হয়, তখন এটা আরও বেশি গুরুতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, জিহাদ হলো একটি ইবাদত, যা আমাদের সময়ে একটি ফরজ ইবাদত। ইবাদতের ক্ষেত্রে স্রেফ সমর্থনের কোনো ধারণা সাহাবিগণ রা.-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত দীন ইসলামে ছিল না। কোনো সুস্থ মস্তিকের দীনের বুঝসম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনি কখনো বলতে দেখবেন না, 'আমি মাগরিবের তিন রাকআত সালাত সমর্থন করি; যদিও নিজে আদায় করি না।' তারচেয়েও বড় কথা হলো, এই ব্যক্তিকে কেউ কখনো আমার 'নামাজি ভাই' বলে কিন্তু সম্বোধন করবে না। আর না-ই-বা সে নামাজি হিশেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য হবে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে; কিংবা সাধারণ মানবিক বিচার-বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে—যতক্ষণ-না সে কার্যত ফরজ সালাত সম্পন্ন করছে। একইভাবে কেউ কিন্তু কখনো বলে না 'আমি রমজানের সিয়াম সমর্থন করি। এটাকে ফরজ মনে করি। যারা সিয়াম পালন করছে, তাদের প্রতিও সমর্থন জ্ঞাপন করি। তারা খুব ভালো কাজ করছে। তবে আমি নিজে সিয়াম পালন করি না।' সম্ভবত এখানে একটু ভুল করলাম। দুঃখজনকভাবে আমাদের সময়ে কিছু জিন্দিক এবং সেকুলার মুসলিম বাংলাদেশে আছে, যারা এমন কথা বলে। তবে শরয়িভাবে এ ধরনের কথার ভিত্তি নেই। উপরন্তু এমনটা কেউ করলে ফরজ আমল থেকে বিনা ওজরে বিরত থাকার কারণে সেই ব্যক্তি ফাসিক বলে গণ্য হবে। মনে রাখতে হবে, এই দীন স্রেফ তাত্ত্বিকতার দীন নয়। দীনের আবশ্যকীয় বিষয়ে শুধু সমর্থন করে বসে থাকার সুযোগ আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। ইবাদতের বিষয়গুলো আমাদের সমর্থনসাপেক্ষ নয়; বরং এগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হলো শোনার ও মানার।

Scanned by CamScanner

আপনি জেনেছেন, ফজরের দুই রাকআত সালাত ফরজ। এখন আপনি বাধ্য এই দুই রাকআত সালাত আদায় করতে। আপনি যদি তা না করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলেন এবং আপনার এ অবস্থানের কোনো শরয়ি যৌক্তিকতা বা জাস্টিফিকেশান নেই। এখানে আপনি সমর্থনের কথা বলে পার পাবেন না।

এখন চিন্তা করুন জিহাদের কথা। সালাফদের, সকল মাজহাবের ইমামদের অবস্থান অনুযায়ী বর্তমানে জিহাদ ফরজে আইন। অর্থাৎ, বর্তমানে জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফরজ, যেভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফজরের দুই রাকআত সালাত ফরজ।[১২] একই সঙ্গে শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ.-এর বিখ্যাত ফাতওয়া, যা এখনো রদ করা কিংবা অপনোদন করা মুরজিয়া আলিমদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি—তা অনুযায়ী হিন্দুস্তান দারুল হারব, যেখানে জিহাদ ফরজ। যেসব 'জিহাদ সমর্থক মানহাজের ভাই' আছেন, তারাও কিন্তু জিহাদ যে ফরজে আইন—একথা স্বীকার করেন। তাহলে প্রশ্ন হলো, কেউ যদি এটা স্বীকার করে, তবে তার করণীয় কী? অবশ্যই তার জন্য আবশ্যক, এই ফরজ কাজে শামিল হওয়া। এখানে মাঝামাঝি কোনো কিছু নেই। দীনের যেকোনো ফরজ বিধান সম্পর্কে ব্যক্তি অবগত হওয়া-মাত্র তার ওপর সেই বিধান ফরজ। অর্থাৎ, সে বাধ্য তখন তা পালন করতে। এখানে নিছক সমর্থনের কোনো সুযোগ নেই। অন্যথায় মুসলিম মাত্রই জিহাদ সমর্থন করে। র‍্যান্ড মৌলবি শাহবাগী ফরিদ উদ্দিন মাসউদও তো জিহাদ সমর্থন করে। কারণ, জিহাদ অস্বীকার করা কুফর। সমস্যাটা জিহাদ সমর্থন নিয়ে কখনোই ছিল না। যে-সকল আলিম সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিত্রতা করতে বলেছিল, তারাও কিন্তু জিহাদ সমর্থন করত।

কিন্তু তারা কী সমর্থন করত না? তারা কীসের বিপক্ষে ছিল? তাদের সমস্যাটা কী নিয়ে ছিল? তাদের সমস্যা ওই মুহূর্তে জিহাদ করা নিয়ে ছিল। তাদের সমস্যা ছিল, তাত্ত্বিকভাবে তারা যে বিষয়কে দীনের ফরজ বিধান হিশেবে স্বীকার করে নিয়েছেন, তার ওপর সঠিকভাবে আমল করা নিয়ে। নিজে জিহাদ করা নিয়ে। যতক্ষণ জিহাদ একটি দূরবর্তী ও তাত্ত্বিক বিষয়রূপে থাকে, ততক্ষণ সবাই এর পক্ষেই কথা বলে; কিন্তু যখনই তাগুতের সামনে আজ, এখন, এখানে জিহাদ করার কথা আসে, তখন সমস্যাটা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। দুঃখজনকভাবে এই হাজার বছরের পুরানো ব্যাধি এখনো প্রবলবিক্রমে বিদ্যমান এবং আজ শুধু উলামায়ে সু'রাই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত নয়।

---

১২ বিস্তারিত জানতে দেখুন—*মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা*, শায়খ আবদুল্লাহ আজজাম রাহ.।

Scanned by CamScanner

এ তো গেল ফরজ জিহাদের কথা। এবার আসি জিহাদের মানহাজ অর্থাৎ, দীন কায়েমের পদ্ধতি হিশেবে জিহাদকে বেছে নেওয়া এবং তার অনুসরণ করার অর্থ প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে মহান ইমাম ও মুজাদ্দিদ শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ. বলেন,

‘সুতরাং এই মানহাজ, যা আমাদের সামনে ভোরের মতো স্বচ্ছ, তা কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার বিবরণ শরিয়ার দলিলেই উল্লেখিত পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

হে ইমানদাররা, তোমাদের থেকে যে-কেউই তাদের দীন পরিত্যাগ করবে, তবে আল্লাহ অপর কোনো সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা ইমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ। [সুরা মায়িদা : ৫৪]

সুতরাং আমরা যে অবস্থায় রয়েছি, এই আয়াতটি সেই সম্পর্কে বলছে, ‘হে ইমানদাররা, তোমাদের থেকে যে-কেউই তাদের দীন পরিত্যাগ করে,...।’

যখন রিদ্দাহ বা দীনত্যাগের ফিতনা সংঘটিত হয়, তখন মানুষকে দীন ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য কী কী গুণাবলি প্রয়োজন? এখানে ছয়টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—

‘যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে। তারা ইমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর,...।’ সুতরাং এই সকল গুণ অর্জন করা আমাদের জন্য জরুরি :

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি একান্ত ভালোবাসা।
২. ইমানদারদের প্রতি বিনয় ও সহানুভূতি।
৩. কল্যাণের সঙ্গে সাহায্য করা এবং তা করা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।
৪. কাফিরদের প্রতি কঠোরতা; আর এটা ইসলামের সবচাইতে শক্তিশালী

Scanned by CamScanner

বন্ধন 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আমরা ইমানদারদের সঙ্গে ভালোবাসা ও কর্তব্যপরায়ণতার সম্পর্ক স্থাপন করি এবং আমরা কাফিরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি; আর তাদের সঙ্গে খুব কঠোর আচরণ করি।

৫. এরপর ৫ম এবং ৬ষ্ঠ গুণ হলো, '...তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না।'

মানুষদেরকে দীনে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করা—এ বৈশিষ্ট্য দুটোর গুরুত্ব অত্যধিক।

সুতরাং যারা এমন মনে করে যে, (এ সকল গুণ অর্জন করা ব্যতীত) মানুষকে দীনে ফিরিয়ে আনা এবং একটি ইসলামি ভূমি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যখন কিনা ইসলামের ছায়া পৃথিবীর বুক থেকে অপসারিত হয়েছে, তবে এমন মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার মানহাজ উপলব্ধি করতে পারেনি। কারণ, এই আয়াতটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং স্পষ্টত প্রতীয়মান একটি আয়াত।[১৩]

এরপর শায়খ উসামা রাহ. রাসুল ﷺ-এর নিম্নলিখিত হাদিসটি উল্লেখ করেন,

> আর আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন; আর তা হলো শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত এবং জামাআত।[১৪]

এরপর তিনি বলেন, 'এই হাদিসের আলোকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, প্রথম পাঁচটি বিষয়, যা হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, এগুলোকে অপর পাঁচটি বিষয় ব্যতীত মানবজাতির জন্য একটি শাসনব্যবস্থা বা কর্মপদ্ধতি হিশেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একইভাবে একজন ব্যক্তির জন্য প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়া সম্ভব হয় না, যখন সে মানবরচিত বিধানের দ্বারা শাসন করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের কর্তৃত্ব না থাকে। আর আমরা যদি এই পাঁচটি বিষয়কে মনোযোগ দিয়ে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন গোত্রের প্রতি রাসুল ﷺ-এর দাওয়াতের বাস্তবতার সঙ্গে এই পাঁচটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ এবং দৃঢ় সমর্থক।

আর আমরা যখন আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণের চেষ্টা করি, তখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, ইসলামি ভূমি প্রতিষ্ঠা এবং দীন

১৩ *মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা*, আস-সাহাব মিডিয়া।

১৪ *সুনানুত তিরমিজি ও মুসনাদু আহমাদ*।

Scanned by CamScanner

সম্প্রসারণের পদ্ধতি হিশেবে এগুলোর কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে :

১. একটি জামাআত।

২. আদেশ শোনা।

৩. আনুগত্য করা।

৪. হিজরত করা।

৫. জিহাদ করা।

সুতরাং যারা হিজরত এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত ইসলামের জন্য কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এরূপ মানুষেরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মানহাজ উপলব্ধি করতে পারেনি। আর যদি তারা উপলব্ধি করে থাকে, তবে তারা এর ওপর আমল করেনি; বরং তারা অন্য ধরনের আনুগত্য ও ইবাদতের দ্বারা নিজেদের ব্যস্ত রাখছে। সুতরাং এরূপ মানুষেরা এসকল বড় ইবাদতের ভারী ফল থেকে পলায়ন করছে। কারণ, নিশ্চয়ই জিহাদ একটি কষ্টকর আমল, যা আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখন পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, জামাআত ও জিহাদের গুরুত্ব অত্যধিক।'[১৫]

সুতরাং কিছু সুনির্দিষ্ট গুণ বা বৈশিষ্ট্য এ মানহাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ.-এর ভাষায় একজন ব্যক্তি তখন এ মানহাজের অনুসরণকারী হবে, যখন সে মানহাজের আবশ্যক শর্তাবলির ওপর আমল করবে। অর্থাৎ, সে জামাআতবদ্ধ হবে, শুনবে ও মানবে, হিজরত ও জিহাদ করবে। অর্থাৎ, মানহাজের বিষয়টি আমলের সঙ্গে সম্পর্কিত; কোনো একটি মনোভাব অন্তরে ধারণ করার সঙ্গে নয়। আর এটাই স্বাভাবিক। শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ.-এর কথা থেকে স্পষ্ট যে, এ মানহাজ সমর্থনের মানহাজ নয়; বরং এ মানহাজ হলো জামাআতবদ্ধ হওয়া, শোনা ও মানা, হিজরত ও জিহাদের মানহাজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখানে জামাআতবদ্ধ হবার উল্লেখ দেখে অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই। কারণ, জিহাদ মূলত একটি জামাআতবদ্ধ ইবাদত। আমরা এ ক্ষেত্রে জামাআতবদ্ধ হওয়া বলতে কোনো নির্দিষ্ট জামাআতে আবদ্ধ হওয়াকে বুঝাচ্ছি না। আমরা নিজেদের জামাআতের ব্যাপারে ব্যাপক অর্থ প্রয়োগ করে নিজেদের জামাআতকেই খারেজিদের মতো মুসলিমদের একমাত্র বৈধ জামাআত মনে করি না।

তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তি, যে এ কাজগুলো উপযুক্ত ওজর ছাড়া ছেড়ে দেয়;

---

১৫ *মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা*, আস-সাহাব মিডিয়া।

Scanned by CamScanner

কিন্তু বলে বেড়ায় সে এ মানহাজের সমর্থক। তাকে 'মানহাজের ভাই' বলা যেতে পারে? শরয়ি বিচারে, মানহাজের অর্থগত বিচারে এবং বর্তমান সময়ে যারা জিহাদের মানহাজকে আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তাদের বিবৃত মাপকাঠির আলোকে কোনো বিবেচনাতেই তো এরকম একজন ব্যক্তিকে; সে যতই অন্তরঙ্গ বন্ধু বা শ্রদ্ধাভাজন দীনি ভাই হন না কেন, এই মানহাজের অনুসারী বলা যায় না। স্রেফ সমর্থনের কোনো মানহাজ এ দীনের মধ্যে নেই। এ দীন তো মাদ্রিদ-বার্সেলোনার এল ক্লাসিকো না বা ভারত-পাকিস্তানের কোনো খেলা না যে, জার্সি পরে সমর্থন করলেই হয়ে গেল। এটাতো এমন হয়ে গেল, যেন কেউ বলছে, 'আমি প্রাউড নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিম'। আর তারপর আরেকজন এসে বলল, 'হ্যাঁ, উনি সাচ্চা মুসলিম'! দীন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম কথার, এরকম অবস্থানের ভিত্তি কি আদৌ আছে?

শায়খ আবু হামজা উসামা তো যথার্থই বলেছেন, এ মানহাজ কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি মানহাজেরই কিছু সুনিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি থাকে। যার আদর্শ ও আমলে যে মানহাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে, তিনি সে মানহাজের অন্তর্ভুক্ত হিশেবে বিবেচিত হবেন। এ তো নিছক মৌখিক দাবির বিষয় নয়। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশে ইসলামের জন্য, দীনের সুরক্ষার জন্য, দীনের খেদমতের জন্য, দীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং উম্মাহর সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর হক ও বান্দাদের হকের প্রতি লক্ষ রেখে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজটি এই মুহূর্তে করা উচিত বা আপনি নিজে কোন কাজটি করবেন? এ প্রশ্নের জবাবে কেউ যদি বলে, বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইমান ও আমলের মেহনত করা, তাহলে সেটা তার মানহাজ। যদি কেউ বলে, বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মানুষকে আসারি আকিদা গ্রহণ করানো, দাওয়াতের মাধ্যমে শিরক ও বিদআত দূর করা এবং দেওবন্দি, আশআরি ও মাতুরিদিদের প্রভাব বিনষ্ট করা, তবে সেটা তার মানহাজ। যদি কেউ বলে, বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ক্রিটিক্যাল থিংকিং করা, শরিয়া নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজন অনুসারে ইসলামের সংস্কারধমী কাজ করা, তবে সেটাই তার মানহাজ। যদি কেউ বলে, বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইসলামি ধারার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে সমাজসেবা করা, তবে সেটাই তার মানহাজ। কারও উত্তর যদি হয়, বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইলমচর্চা, তাজবিদ শেখা এবং আরবি শেখা ও শেখানো, তবে সেটাই তার মানহাজ। কেউ যদি বলে, বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মিডিয়াসেল

Scanned by CamScanner

তৈরি করে মিডিয়াকেন্দ্রিক দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া, তবে সেটাই তার মানহাজ। কিন্তু এর কোনোটি তাওহিদ এবং হাদিদের (লোহার), দাওয়াত এবং জিহাদের মানহাজ নয়। কারণ, উপরিউক্ত মানহাজের ওপর আমলকারীরা যদিও এ কাজগুলো করেন; কিন্তু তারা জিহাদ করেন না। শুধু জিহাদি জামাআতের সদস্যদের মধ্যেই জিহাদের এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ কারণে জিহাদের এ ফরজ বিধান একমাত্র জিহাদি জামাআতের সদস্যরাই পালন করছেন, পাশাপাশি তারা অন্যান্য দীনি খেদমতেও শরিক থাকছেন। এ জন্য জরুরি নয় যে, জামাআতের সকল সদস্য প্রতিমুহূর্তেই কার্যত যুদ্ধে থাকতে হবে; বরং জিহাদি জামাআতের সদস্য হিশেবে যে ভাই মিডিয়ার কাজ করছেন, তিনি জিহাদের সহায়ক ও সম্পূরক হিশেবেই তা করছেন। তিনি জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিডিয়ার কাজ করছেন না। একই কথা সে দায়ি ভাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যিনি আল্লাহর ইবাদত ও তাগুত বর্জনের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। প্রতিটি মুসলমান যেন তাওহিদে আমলি এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এ জন্য চেষ্টা-সাধনা করছেন। শরয়ি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে, এমন জামাআতের সঙ্গে যিনি নিজে আবদ্ধ হয়েছেন এবং অন্যকে আহ্বান করছেন। অন্যদিকে উপরিউক্ত মানহাজসমূহের ধারকরা নিজে জিহাদের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং অন্যদেরও নিষ্ক্রিয় হবার শিক্ষা দেন। আর তাদের সক্রিয়তা থাকে শুধু নিষ্ক্রিয় সমর্থনের ক্ষেত্রে। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

উহুদের দিন যারা যুদ্ধে যায়নি, তারা জিহাদ সমর্থন করত নাকি করত না? এ নিয়ে কিন্তু সৃষ্টিজগতের কাউকে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। খন্দকের দিনগুলোতে কে জিহাদ সমর্থন করেছিল আর কে তা অসমর্থন করেছিল, এ হিসাব কিন্তু করা হয়নি। তাবুকের সময় যারা পেছনে বসে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ জিহাদ সমর্থন করত কি না এ ব্যাপারটি যাচাইয়ের জন্য কোনো নির্দেশই কুরআনের কোনো আয়াতে দেওয়া হয়নি। পরিমাপ করা হয়েছে আমল। যারা মুমিন, তারা নিজেদের বিশ্বাসের প্রমাণ কাজের মাধ্যমেই দিয়েছে। আর যারা ওজরবিহীন হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে, তাদের সমর্থন থাকা বা না থাকা গুরুত্ব পায়নি। গুরুত্ব পেয়েছে ফরজ ইবাদতের ব্যাপারে তাদের নিষ্ক্রিয়তা, যার ভিত্তিতে তাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় কড়া ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

এ দীন নিষ্ক্রিয়তার দীন না। ইমান থেকে শুরু করে জিহাদ—এ দীনের কোনো কিছুই মুখে বুলি আওড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না; বরং প্রতিটি বিষয়ের জানান নিজের কার্যক্রমের মাধ্যমে দিতে আমরা বাধ্য, তত্ত্বকে জীবনে প্রয়োগ করতে আদিষ্ট। আল্লাহ

Scanned by CamScanner

তাআলা বলেন,

> তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ-না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে। আর তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। [সুরা তাওবা : ১৬]

আমরা কি মনে করছি, আল্লাহর দীনের বিধানগুলো ঠুনকো কিছু—যখন চাইলাম মানলাম; আবার যখন চাইলাম সমর্থনসাপেক্ষে ছেড়ে দিলাম? এমন বিভ্রান্তি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ব্যক্তির অবস্থান ফরজ ত্যাগকারী কারও অবস্থার মতোই। শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ. বলেন,

'...অন্তরগুলো আজ কেবলই দোদুল্যমান এবং যাদের ওপর আল্লাহ দয়া করেছেন তারা ব্যতীত সকলেই আল্লাহর দীনকে সাহায্য করার বদলে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুবকদের বুঝতে হবে যে, জিহাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন নেতৃত্বে বড় আকারের ঘাটতি রয়েছে; আর আমাদের এরূপ মানুষদের কথাকে সেভাবেই উল্লেখ করতে হবে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন।

এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত জিহাদ না করে বসে রয়েছে, তার অবস্থার বর্ণনা কুরআনে খুবই পরিষ্কার এবং অবশ্যম্ভাবী। আর তা হলো, "ফিসক"। "আর যদি তারা বের হবার ইচ্ছা পোষণ করত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত; কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, আর তাই তাদেরকে বলা হলো, "তোমরা বসে থাকো বসে থাকা লোকদের সঙ্গে।" [সুরা তাওবা : ৪৬]'[১৬]

কোনো মুসলিম ভাইয়ের মনে কষ্ট দেওয়া বা কাউকে হেয় করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মুসলিম ভাই হিশেবে প্রতিটি ভাই আমাদের কাছে প্রিয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন। সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউসে একত্রিত করুন। আমাদের ক্ষেত্রে 'মুসলিম ভাই' পরিচয়টাই যথেষ্ট। এর বেশি আর কোনো পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। হ্যাঁ, কাউকে যদি মানহাজের ভাই বলতেই হয়, তবে হেলাফেলার সঙ্গে কাউকে বলা সম্ভব না। একদিকে রক্ত, রিমান্ড, জালিমের জিন্দানখানা, অবর্ণনীয় নিপীড়ন, হুকুমের গোলামদের বক্ষ বিদীর্ণকারী বুলেট, গুম

১৬ *মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা*, আস-সাহাব মিডিয়া।

Scanned by CamScanner

বা ফাঁসির কাষ্ঠ; আর অপরদিকে নিস্তরঙ্গ নিষ্ক্রিয় সমর্থন—এ দুটো কি কখনো এক হতে পারে? আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের কারণে ঘরছাড়া আমাদের ভাইদের কথা। আমরা ভুলে যেতে পারি না আল্লাহর দীনের জন্য দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আমাদের ভাইদের কথা। আমরা ভুলে যেতে পারি না দিনের পর দিন রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে সুযোগের অপেক্ষায় আল্লাহর শত্রু ও আমাদের শত্রুদের শিকারী বাঘের মতো অনুসরণ করতে থাকা মুজাহিদদের কথা। আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের কারাগারে বন্দি আমাদের ভাইদের কথা। আমরা ভুলে যেতে পারি না খুন ও গুমের শিকার হওয়া ভাইদের কথা। আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের হাতে নিহত আমাদের ভাইদের কথা, যাদের রক্তের বদলা নেওয়া আমাদের ওপর আজ ওয়াজিব হয়ে আছে। এ ভাইয়েরা কোনো নির্দিষ্ট সংগঠনের হওয়া আবশ্যক নয়; বরং আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের পথে প্রচেষ্টারত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী যত ভাই আছে, তারা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই অবস্থানরত হোক না কেন, সকলেই আমাদের মানহাজের ভাই। তারাই আমাদের প্রকৃত ভাই। তাদের রক্তই আমাদের রক্ত। তাদের কষ্টই আমাদের কষ্ট। তাদের অশ্রুই আমাদের অশ্রু। এসব কিছু উপেক্ষা করে, এত সব ত্যাগ-তিতিক্ষা ভুলে কেবলই লাইক-কমেন্ট করে অ্যাকটিভ থাকা, সাপ্তাহিক হালাকা করা আর কেবলই নিষ্ক্রিয় সমর্থন ধরে রাখাকে আমরা এক করে ফেলতে পারি না। প্রথম দলটি কখনোই দ্বিতীয় দলটির মতো নয়। যে সমুদ্রে ঝড় নেই, সে সমুদ্র তো আমাদের নয়।

শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ. কত সুন্দর বলেছেন, 'যদি একজন ব্যক্তি জিহাদ না করে বসে থাকে এবং রাস্তা থেকে কাঁটা বা তার সদৃশ কোনো বাধা সরানোর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, যেটা কিনা ইমানেরই একটি শাখা—যখন কিনা জিহাদ প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজে আইনে পরিণত রয়েছে, তখন তার সেই কর্মের ব্যাপারে এরূপ বলা হবে না যে, "আল্লাহ যেন তাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন"; বরং, আমাদের দ্বীনের মাঝে সে একটি ফাসিক ব্যক্তি হিশেবেই বিবেচিত হবে, যে তাওহিদের কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীনকে সাহায্য করার ফরজ কর্তব্য থেকে পলায়ন করেছে।

সুতরাং এই প্রধান বিষয়টির ব্যাপারে সচেতন থাকা অতি জরুরি বিষয়। কিছু ব্যতিক্রম স্থান ব্যতীত প্রায় সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডেই যার অনুপস্থিতি আজ সকলের চোখের সামনে সম্পূর্ণ স্পষ্ট।'[১৭]

---

১৭ *মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা*, আস-সাহাব মিডিয়া।

Scanned by CamScanner

ফোরথ জেনারেশন ওয়ারফেয়ার এবং গাজওয়া ম্যানহাটন

৯/১১-এর বরকতময় হামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? এ হামলা কি ছিল শুধু প্রতীকী (symbolic) বিজয় অর্জনের জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধু অ্যামেরিকাকে বিশ্বের সামনে অপমানিত করার জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য? এ হামলা কি ছিল শুধুই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ? তা কি ছিল স্রেফ যুগের হুবালকে আঘাত করার খাতিরে করা একটি আঘাত? এ হামলার উদ্দেশ্য কি ছিল মিডিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি?

৯/১১-এর প্রচলিত ব্যাখ্যা হিশেবে ওপরের এ ধারণাগুলোই অধিক প্রচলিত। এ বরকতময় হামলার আবেগের দিকটি নিয়ে, অ্যামেরিকাকে অপমানিত হতে দেখার তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও এ আক্রমণের শরয়ি বৈধতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হলেও এ হামলার সামরিক ও কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা তুলনামূলকভাবে অনেক কম—বিশেষ করে বাংলা ভাষায়। অথচ ৯/১১-এর হামলা হলো এমন এক ঘটনা, যা আধুনিক সময়ে কুফফারের বিরুদ্ধে উম্মাহর সঙ্ঘাতের পটভূমি সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। ৯/১১-এর আগের পৃথিবী আর ৯/১১-এর পরের পৃথিবী এক নয়। এক প্রাজন্মিক যুদ্ধের প্রথম ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখা আঘাত হলো ৯/১১। খেলার নিয়ম পালটে দেওয়া, দান উলটে দেওয়া এক চাল হলো ৯/১১।

৯/১১-এর কৌশলগত সাফল্য ও এর সামরিক গুরুত্ব এবং যে চিন্তাধারা থেকে ৯/১১ উৎসারিত তা সঠিকভাবে জানা, বোঝা এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা একদিকে যেমন আমাদেরকে সাহায্য করবে অতীতকে বুঝতে ও আমাদের বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে, তেমনিভাবে এটা আমাদের সাহায্য করবে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের চিন্তাকে আলোড়িত করতে।

Scanned by CamScanner

এক. তানজিমের রণকৌশল

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন প্রথমসারির অ্যামেরিকান সামরিক বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেন, ভবিষ্যৎ যুদ্ধগুলোতে সামরিক ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হবে। তাদের ধারণা ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন ধরনের যুদ্ধকৌশলের উদ্ভব ঘটবে এবং পুরানো কৌশলগুলোকে হটিয়ে নতুন এ যুদ্ধকৌশলই যুদ্ধের ময়দান নিয়ন্ত্রণ করবে। তারা এর নাম দেন 'চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ' [Fourth Generation War]। অনেকে একে Assymmetric War [শক্তির ভারসাম্যহীনতার যুদ্ধ] বলেও অভিহিত করেন।

সামরিক ইতিহাসবিদদের মত অনুযায়ী, ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর সামরিক কৌশল ও যুদ্ধের ধরন তিনটি মূল পর্যায়ের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

- প্রথম পর্যায় ছিল সারিবদ্ধভাবে প্রাথমিক যুগের রাইফেল হাতে বিপুলসংখ্যক সেনাশত্রুর বিপরীতে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।
- দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের উদাহরণ হলো অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল গুলিবর্ষণের মাধ্যমে যথাসম্ভব শত্রুসেনা ও শত্রুর সম্পদের ক্ষতির চেষ্টা করা।
- তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধে আগের পর্যায়গুলোর তুলনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ প্রজন্মের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল ট্যাঙ্ক ও বিমানের দ্বারা বিভিন্ন সামরিক বিন্যাস [formation] ব্যবহারের মাধ্যমে শত্রুকে ঘিরে ফেলা। দ্বিতীয় প্রজন্মের ট্রেঞ্চ যুদ্ধে বৈশিষ্ট্য ছিল শত্রুকে সামনে থেকে ঘিরে ধরা। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মে এ কৌশল পরিবর্তন করে ফ্রন্টলাইনের পরিবর্তে পেছন থেকে শত্রুকে ঘিরে ধরার কৌশল গৃহীত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চতুর্থ পর্যায়ের যুদ্ধ একটি নতুন ধরনের যুদ্ধ। এতে যুদ্ধ হবে মূলত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থানে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। কেবলই শত্রুর সামরিক স্থাপনা ও সেনাবাহিনীকে আঘাত করার মধ্যে এ যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং শত্রুর দেশ বা জাতির সমাজও এ যুদ্ধের আওতায় পড়বে। এ যুদ্ধের একটি মূল লক্ষ্য হবে শত্রুর সেনাবাহিনী বা যোদ্ধাদের প্রতি তাদের নিজস্ব সমাজের যে সমর্থন, তা নষ্ট করে দেওয়া। এ কারণে এ যুদ্ধে ১০-২০ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার একটি ডিভিশনের চাইতে টিভি চ্যানেলগুলোর সংবাদ শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর কার্যকর অস্ত্র হিশেবে সাব্যস্ত হতে পারে।

Scanned by CamScanner

বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তির মাঝের পার্থক্যগুলো ক্রমশ মুছে একপর্যায়ে বিলীন হয়ে যাবার অবস্থা হবে। অর্থাৎ, যুদ্ধাবস্থা এবং শান্তিকালীন অবস্থার মাঝে যে পার্থক্য আগের পর্যায়গুলোতে ছিল, সেটা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে মুছে যাবে। এক অর্থে বলা যায়, যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালার আগে উভয় পক্ষই অবিরাম যুদ্ধে [Perpetual War] লিপ্ত থাকবে।

আরেক দল সমরবিদ এ বিশ্লেষণের কিছু বিষয়ের সঙ্গে দ্বিমত করলেন। তাদের দাবি ছিল চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের মূল কৌশলগত ফোকাস হবে শত্রুর মনস্তত্ত্বের ওপর এবং প্রতিপক্ষের সামরিক নীতিনির্ধারক ও কৌশলবিদদের চিন্তাকে প্রভাবিত করার ওপর। কেবলই যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধবিন্যাস নয়; বরং চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভূমিকা পালন করবে মিডিয়া এবং সকল ধরনের ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক। এগুলোর উদ্দেশ্য হবে প্রতিপক্ষ দেশ বা জাতির সাধারণ জনগণ ও অভিজাতশ্রেণির চিন্তা ও জনমতকে প্রভাবিত করা।

এ দলের বিশেষজ্ঞরা আরও দাবি করলেন, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ হবে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র পর্যায়ের। একটা বিশাল ময়দানে বা কোনো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সামনাসামনি যুদ্ধের বদলে এ যুদ্ধ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। আর এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হবে ভূতের মতো। যার আবির্ভাব ঘটবে হঠাৎ, আবার হঠাৎ করেই সে মিলিয়ে যাবে। একই সময় একাধিক জায়গায় তার উদয় হবে, আবার তাকে ধাওয়া করতে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যাবে। এ যুদ্ধের ফোকাস হবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক। এ যুদ্ধ হবে সর্বব্যাপী। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশ, গোত্র ও আন্তর্জাতিক বাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনও অংশগ্রহণ করতে পারে। এ যুদ্ধের ধরন, এ যুদ্ধের ধারণা হবে সম্পূর্ণ নতুন। তবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিভিন্ন যুদ্ধকৌশল চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমা সমরবিদরা এই নতুন ধরনের যুদ্ধের আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারা এ পূর্বাভাসও করেছিলেন যে, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ পশ্চিমা সামরিক শক্তির জন্য বেশ কিছু জটিলতার সৃষ্টি করবে। আর তাই এ যুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য পশ্চিমা সামরিক বাহিনীগুলোকেও মৌলিকভাবে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে—দর্শন ও বাস্তবায়ন [Ideology & Operation] উভয় ক্ষেত্রেই।

পশ্চিমা সমরবিদরা শূন্য থেকে এসব পূর্বাভাস করেননি। তাদের এ পূর্বাভাস

Scanned by CamScanner

ও বিশ্লেষণ ছিল বাস্তবতার নিরিখেই। তবে উম্মাহর মাঝে থাকা কাপুরুষরা এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে তাদের আয়ুকাল কাটিয়ে দিতেন চান তাদের কল্পনার জগতেই। বাস্তবতা হলো, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে গেছে। এ যুদ্ধকৌশল সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে এ যুদ্ধে কাগজে-কলমে দুর্বল পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এবং একাধিক ক্ষেত্রে জাতি-রাষ্ট্র পরাজিত হয়েছে কোনো রাষ্ট্রহীন জাতির কাছে।

দুই. উম্মাহর বিজয়

মুসলিম উম্মাহ অল্প সময়ের ব্যবধানে উল্লেখযোগ্য সামরিক বিজয় অর্জন করেছে। উসমানি সালতানাতের পর এত কম সময়ের ব্যবধানে এরকম বিজয়ের ঘটনা আর ঘটেনি। গত দুই দশকে উম্মাহ সামরিক বিজয় লাভ করেছে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে, সোমালিয়াতে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে, চেচনিয়াতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ লেবাননে জায়নিস্ট ইসরাইলের বিরুদ্ধে। এ বিজয়গুলো অর্জিত হয়েছিল সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, সর্বোত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন বাহিনীর বিরুদ্ধে। এ বিজয়গুলো অর্জিত হয়েছে, মরুভূমি, পাহাড়, শহরসহ বিভিন্ন স্থানে।

আফগানিস্তানে মুজাহিদরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তিকে পরাজিত করে। সোমালিয়াতে একটি গোত্রের কাছে লাঞ্ছিত হয় অ্যামেরিকা, বাধ্য হয় পিছু হটতে। তার কিছুদিন পর চেচনিয়ার মুজাহিদরা পরাজিত করে রাশিয়ান শ্বেত ভল্লুকদের। তারপর লেবানিজদের কাছে পরাজিত হয়ে জায়নিস্ট ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বোচ্চ পরাশক্তি অ্যামেরিকা পরাজিত হয় ইরাকে এবং দীর্ঘ দেড় যুগ লড়াইয়ের পর এখন আফগানিস্তানেও উপনীত হয়ে আছে পরাজয় বরণের দোরগোড়ায়।

একথা সত্য, এসব সামরিক বিজয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ী শক্তি শাসনক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। এরকম অনেক ঘটনাই পৃথিবীতে রয়েছে। যেমন, ইসলামের নামে ৬ লাখ প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে এক দিনের জন্যও ইসলাম কায়েম হয়নি। তবে এগুলো ভিন্ন আলোচনা। আমাদের এ সামরিক-কৌশলগত বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়। এ লেখাতে আমাদের ফোকাস সামরিক সংঘাত এবং অ্যামেরিকা ও মুজাহিদিনের মধ্য সামরিক শক্তির ভারসাম্যহীনতা নিয়ে। এ ভারসাম্যহীনতার অজুহাত দিয়ে যে পরাজিত মানসিকতার ব্যক্তিরা আজ জিহাদকে এবং বিজয়কে অসম্ভব বলে দাবি করেন, তাদের বিভ্রান্তির জবাব দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

Scanned by CamScanner

উন্নত প্রযুক্তি আফগানিস্তান, সোমালিয়া, চেচনিয়া, ইরাক, ইয়ামেন ও সিরিয়ায় কুফরের ধ্বজাধারী ও তাগুতের রক্ষক এসব বাহিনীকে বিজয় এনে দিতে পারেনি। যদিও এসব বাহিনীর কাছে পৃথিবীকে কয়েক শ বার ধ্বংস করার মতো আণবিক-পারমাণবিক অস্ত্র আছে। স্রেফ হালকা কিছু অস্ত্র নিয়ে মুজাহিদরা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। মুজাহিদরা জনসাধারণের মাঝে থেকে এসে আক্রমণ করেছেন এবং প্রয়োজনে জনগণের মাঝেই মিশে গেছেন। এ কারণেই অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মাইকেল ভিকারস মন্তব্য করেছিল, 'আমাদের অস্ত্র-সরঞ্জাম-প্রযুক্তি ও যুদ্ধকৌশল এ ধরনের যুদ্ধের (4th Generation Warfare) জন্য উপযুক্ত নয়।'

শত্রুর সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও আফগানিস্তান, সোমালিয়া, চেচনিয়া, ইরাক, লেবানন, ইয়ামেন, সিরিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুজাহিদদেরই বিজয় অর্জিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, শক্তি ও সংখ্যা ব্যাপক তারতম্য থাকা সত্ত্বেও দুই দশকে একাধিকবার পৃথিবীর একাধিক সুপার পাওয়ার মুজাহিদদের ক্ষুদ্র দলের কাছে পরাজিত হবার নজির আছে। সুতরাং যেসব কাপুরুষ শক্তির তারতম্য অজুহাত হিশেবে ব্যবহার করে জিহাদের দায়িত্ব থেকে পালাতে চায়, তাদের কুযুক্তি বাস্তবতার নিরিখে টেকে না।

তিন. গাজওয়া ম্যানহাটন

কেউ হয়তো বলতে পারেন, উত্থাপিত সকল উদাহরণই ছিল আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে একটি জাতির প্রতিরোধের। এ উদাহরণগুলো গ্লোবাল জিহাদিদের ক্ষেত্রে খাটবে না। কারণ, গ্লোবাল জিহাদিরা নিজস্ব ভূখণ্ডের বাইরে গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে।

এ কথার উত্তর হলো :

১. গ্লোবাল জিহাদিরা তালিবানের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করে; আর তালিবানরা তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডেই যুদ্ধ করছে।

২. প্রথম থেকেই গ্লোবাল জিহাদের মুজাহিদরা প্রমাণ করেছে যে, তারা প্রচলিত আন্তসংঘাতসমূহের নীতি অনুসরণ করে তাদের যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ করে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অ্যামেরিকার অন্য শত্রু রাষ্ট্রগুলো দশকের পর দশক ধরে অজস্র অর্থ-সম্পদ খরচ করে যা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, গ্লোবাল জিহাদিরা সীমিত সামর্থ্য নিয়ে তা অর্জন করেছে। গ্লোবাল জিহাদিরা একটিমাত্র আঘাতে নিজ

Scanned by CamScanner

ভূখণ্ড রক্ষার জন্য অ্যামেরিকার ব্যবহৃত কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যূহের [Strategic Defense] সবগুলো স্তরকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। অ্যামেরিকার কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যূহের স্তরগুলো নিম্নরূপ :

১. পূর্বাভাস [Early Warning],

২. আক্রমণের পূর্বে প্রতিরোধক আঘাত [Preventive Strike],

৩. নিবৃত্তকরণের নীতি [Principal of Deterrance]।

১. পূর্বাভাস [Early Warning]

৯/১১-এর হামলাগুলো ছিল সামরিক ইতিহাসের সর্বাধিক কার্যকর ও সফল অতর্কিত হামলাগুলোর একটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে অ্যামেরিকার পার্ল হারবারে জাপানের হামলা, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নাজি জার্মানির হামলা, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক অতর্কিতে চেকোস্লোভাকিয়াতে হামলা, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে আরব আর্মিদের অভাবিত সাফল্যমণ্ডিত হামলা—এ সবই সফল অতর্কিত হামলার উদাহরণ।

আক্রমণের কার্যকারিতা এবং শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির বিবেচনায় গ্লোবাল জিহাদিদের এসব হামলা ছিল এ ধরনের অন্য সকল আক্রমণের তুলনায় অধিক সফল। কারণ, এসব আক্রমণের পর আক্ষরিকভাবেই প্রতিটি অ্যামেরিকান নাগরিকের মনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সকলেই আশঙ্কা করছিল, যেকোনো সময়ে যেকোনো কিছু ঘটে যাবার। একটি দেশের মধ্যে এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সে দেশের অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্বের ওপর তা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। বিশেষকরে অ্যামেরিকার মতো একটি সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও বেশি। কারণ, অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধের পর নিজ ভূমিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা মার্কিনিরা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

অ্যামেরিকার বিশাল গোয়েন্দাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও, নজরদারি করার জন্য প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ তাদের কাছে থাকার পরও তারা এ আক্রমণকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা এ আক্রমণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতেও ব্যর্থ হয়েছিল।

বিবেচনা করুন, ইউএসএস কোল একটি যুদ্ধজাহাজ হিশেবে যুদ্ধাবস্থার প্রস্তুতি নিয়েই ছিল। তথাপি অ্যামেরিকা ইউএসএস কোলকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাহলে যেখানে একটি সতর্ক ও যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়া সামরিক টার্গেটকে এ ধরনের আক্রমণের হাত থেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়, সেখানে কীভাবে একটি

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে এ ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করা বা সতর্ক রাখা সম্ভব? সুতরাং চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার নিরাপত্তা ব্যূহের প্রথম স্তরের কার্যকারিতা অনেকাংশেই কমে যায়, যার প্রমাণ হলো ৯/১১-এর হামলা।

২. আক্রমণের পূর্বে প্রতিরোধক আঘাত [Preventive Strike]

নিজ ভূখণ্ডকে রক্ষার জন্য অ্যামেরিকার তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যূহের এ স্তরটিও ৯/১১-এর দিন ব্যর্থ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ স্তরটি প্রথম স্তরের ওপর নির্ভরশীল। একটি সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক হবার পরেই কেবল সে আক্রমণ বন্ধে প্রতিরোধক আঘাত করা যায়। যদি আমরা ধরেও নেই যে, অ্যামেরিকার কাছে একটি সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে কিছু তথ্য ছিল, তথাপি গ্লোবাল জিহাদিদের ওপর প্রতিরোধক আক্রমণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। যেহেতু গ্লোবাল জিহাদিরা হলো এমন একটি সংগঠনের সদস্য, যারা অতি দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে এবং কোনো নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘসময় অবস্থান করে না। সহজ ভাষায় এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে গেলে নিশ্চিতভাবে আপনি তাদেরকে পাবেন। তারা একইসঙ্গে একাধিক জায়গায় থাকতে পারে, আবার কোথাও না-ও থাকতে পারে। যেমন ৯/১১-এর আক্রমণকারীরা আক্রমণের আগে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় একত্রিত হয়ে অবস্থানরত ছিল না। যদি ঘটনাক্রমে সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখ কোনো আক্রমণে শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ.-সহ অন্য নেতারাও নিহত হতেন, তবুও অ্যামেরিকার পক্ষে সম্ভব হতো না ৯/১১-এর আক্রমণ ঠেকানো।

৩. নিবৃত্তকরণের নীতি [Principal of Deterrance]

নিবৃত্তকরণের এ নীতি গড়ে উঠেছে একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে। ধারণাটি হলো, প্রত্যেক যুদ্ধে দুটি পক্ষ থাকে, যারা যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন ও স্বার্থরক্ষার জন্য। এ ধারণাটিকে মূলনীতি হিশেবে ধরেই নিবৃত্তকরণের নীতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু যদি কোনো সংঘাতের ক্ষেত্রে একপক্ষ এমন হয় যে, তারা বেঁচে থাকার চাইতে শহিদ হওয়াকে বেশি পছন্দ করে, তখন এ নীতি আর কার্যকারী থাকে না।

এ কারণে দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধে নিবৃত্তকরণের নীতি অত্যন্ত কার্যকারী। কিন্তু একটি সংগঠন, যার স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই, পশ্চিমা কোনো ব্যাংকে যার জমা করা কোনো পুঁজি নেই, যে সংগঠন অন্য কোনো দেশের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য বা

Scanned by CamScanner

ত্রাণ পাবার ওপর নির্ভরশীল নয়, এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ নীতি সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর। এ ধরনের প্রতিপক্ষকে নিবৃত্ত করার মতো কোনো চালই শত্রুর হাতে থাকে না। কারণ, এ ধরনের সংগঠন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। আর শুরু থেকেই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো শত্রুর সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া।

তো কীভাবে আপনি এমন কাউকে নিবৃত্ত করবেন, যে পুরো দুনিয়ার মোকাবিলায় মৃত্যুকে অধিক ভালোবাসে?

অ্যামেরিকার প্রতিরক্ষাব্যূহের এ তিনটি স্তরকে ধ্বংস করার পাশাপাশি গ্লোবাল জিহাদিরা অ্যামেরিকাকে তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর মনস্তাত্ত্বিক আঘাত করেছে। গ্লোবাল জিহাদিদের এ হামলার সমপর্যায়ের কোনো হামলা অ্যামেরিকার মনোবল ও মনস্তত্ত্বের ওপর কখনো এভাবে প্রভাব ফেলেনি। পশ্চিমা সমরবিদদের মতে, প্রতিপক্ষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকারী কৌশলগুলোর অন্যতম হলো তাকে এমন জায়গায় আঘাত করা, যেখানে সে নিরাপদ ও সুরক্ষিত বোধ করে। নিউইয়র্কের সেই রৌদ্রোজ্জ্বল ও কর্মব্যস্ত দিনে মুজাহিদরা ঠিক এ কাজটিই করেছেন।

সুতরাং কাপুরুষরা সামরিক শক্তির যে তারতম্যের কথা বলে জিহাদের দায়িত্ব থেকে দৌড়ে পালাতে চায়, পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাচ্ছে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে সেই শক্তির তারতম্যই হতে পারে পশ্চিমা সামরিক শক্তি, বিশেষ করে অ্যামেরিকার সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর। 4G Warfare বা চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ মুজাহিদিনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। অন্যদিকে অ্যামেরিকা তার সামরিক বাহিনীর আকার, তাদের সামরিক আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলের সামনে প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল। কারণ, বর্তমানে আমরা এমন এক সময় পার করছি, যখন প্রতিনিয়ত উম্মাহর যুবারা জিহাদমুখী হচ্ছে। উম্মাহ উপলব্ধি করছে লাঞ্ছনা ও অপমানের যে পর্যায়ে তারা পৌঁছেছে, এর পর হারানোর আর কিছু বাকি থাকে না।

সময় এসেছে ক্রুসেডারদের সর্বাত্মক আক্রমণের মোকাবিলায় ইসলামি আন্দোলনগুলোর চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলে নিজেদের পারদর্শী করে তোলার। সময় এসেছে উপযুক্ত কৌশলগত পরিকল্পনার সঙ্গে উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতির মিশেল ঘটানোর। এ জন্য প্রয়োজন দাওয়াতি কাজের সম্প্রসারণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে জনসমর্থন ও রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করা। এটি একটি শরয়ি দায়িত্ব তো বটেই, পাশাপাশি এটি চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য

Scanned by CamScanner

মৌলিক অংশ। Clausewitz এবং Mao Zedong এর মতো পূর্ব প্রজন্মের সমরকৌশলবিদদের রচনাতেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

অ্যামেরিকা চায় তার সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মুজাহিদদের মনস্তাত্ত্বিক বিজয়কে মুছে দিতে। মুজাহিদদের দুঃসাহসিক ও বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে সহানুভূতি ও সমর্থনের মনোভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, অ্যামেরিকা চায় তা মুছে ফেলতে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন কাপুরুষদের কা কা রব বন্ধ করে দেন। তিনি যেন এ উম্মাহর মাঝে দায়ি ও আলিমদের এমন এক নতুন প্রজন্মের উত্থান ঘটান, যারা হবেন চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের দায়িত্বগ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম।

চার. অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন

৯/১১-এর হামলাকে গ্লোবাল জিহাদের সমরকৌশলের আলোকে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে গ্লোবাল জিহাদের মূল পরিকল্পনা কী এবং কীভাবে তারা এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করছে।

অনেকেই ৯/১১-কে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা বা একটি দর্শনীয় হামলা হিশেবে বিবেচনা করতে চান। অনেকেই চান ৯/১১-এর পর আফগানিস্তানে অ্যামেরিকার আক্রমণ ও ইমারাতে ইসলামিয়ার পতনের মধ্যে ৯/১১-এর হামলার সফলতা-ব্যর্থতার সমীকরণ খুঁজতে; কিন্তু এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চিত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার বদলে চিত্রের ক্ষুদ্র একটি অংশে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

৯/১১ এবং তা যে যুদ্ধের অংশ, সেই যুদ্ধের মনোভাবকে বুঝতে হলে আগে আমাদের বুঝতে হবে ৯/১১-এর পূর্বে ক্রুসেডার ও জায়নিস্টদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধগুলোতে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা কী ছিল। বাস্তবতা হলো, উম্মাহ ছিল নিদ্রাচ্ছন্ন। উম্মাহর অজান্তেই তার সামনে অপেক্ষারত ছিল এক দীর্ঘ, দুরূহ ও ভয়ংকর যুদ্ধ। তা-ও আবার এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে, যার মতো শক্তির মোকাবিলা উম্মাহ এর আগে করেনি। এমন এক শত্রু, যে শুধু সামরিক, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতরই নয়; বরং একইসঙ্গে যে এগিয়ে ছিল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দানেও। মিডিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা, দালাল বুদ্ধিজীবি ও আলিমদের মাধ্যমে এই শত্রু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল মুসলিম উম্মাহর চিন্তার ওপর। যুদ্ধে বিজয় তো দূরের কথা, উম্মাহ

Scanned by CamScanner

বিজয়ের কথা চিন্তা করতেই ভুলে গিয়েছিল। যুদ্ধে যাওয়া তো দূরের কথা, উম্মাহ যুদ্ধ যে হচ্ছে, এটা সম্পর্কেই গাফিল ছিল। শত্রুর মোকাবিলা তো দূরের কথা, উম্মাহ শত্রুকে চিনতেই পারছিল না। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে উম্মাহ নেশাগ্রস্তের মতো টলতে টলতে ঘুরপাক খাচ্ছিল ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা আর অপমানের গোলকধাঁধায়।

সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্লোবাল জিহাদের সামনে ছিল বেশ কিছু জটিল সমস্যা :

১. উম্মাহকে চেনানো তার প্রকৃত শত্রু কে।

২. উম্মাহকে এ যুদ্ধের বাস্তবতা অনুধাবন করানো।

৩. শত্রু যে অজেয় না, তা উম্মাহর সামনে তুলে ধরা।

৪. উম্মাহকে এ যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা, উম্মাহর জড়তাকে ভেঙ্গে দেওয়া।

৫. অ্যামেরিকার বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ নষ্ট করে দেওয়া।

৬. অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি খর্ব করা।

৭. উম্মাহর বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার গোপন যুদ্ধকে প্রকাশ্যে আনতে বাধ্য করা।

৮. এমন এক স্থানে অ্যামেরিকাকে যুদ্ধে আটকে ফেলা, যেখানে কৌশলগতভাবে অ্যামেরিকা হবে দুর্বল।

৯. উম্মাহর ওপর জেঁকে বসা তাগুতগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে যে প্রতিরোধ চলছিল, তাকে একটি কেন্দ্রীয় রূপ দেওয়া।

১০. মুসলিমবিশ্ব জুড়ে অ্যামেরিকার সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করা।

গ্লোবাল জিহাদের কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ছিল না বিশাল ফান্ড, লোকবল কিংবা অস্ত্রভাণ্ডার। সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এ সভ্যতার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা। আর এই যুদ্ধেরও অংশ ৯/১১ বা গাজওয়া ম্যানহাটন।

পাঁচ. অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন

অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হলো একের পর এক আক্রমণের মাধ্যমে—

Scanned by CamScanner

ক. অ্যামেরিকার ‘অজেয়’ রূপ ধ্বংস করে দেওয়া।

খ. অ্যামেরিকাকে মুসলিমবিশ্বে সরাসরি যুদ্ধে টেনে আনা।

গ. অ্যামেরিকার অর্থিনীতিতে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করা।

ঘ. সারা বিশ্বজুড়ে অ্যামেরিকান বাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংহতি (Social cohesion) ধ্বংস করে দেওয়া।

এ উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখেই অ্যামেরিকার ওপর দারুস সালাম, নাইরোবি, ও গাজওয়া ম্যানহাটনের আক্রমণ চালানো হয়। এর ফলে অ্যামেরিকাকে দুটো ফাঁদে পা দিতে আকৃষ্ট করা হয়।

প্রথম ফাঁদটি হলো, অ্যামেরিকার ঔদ্ধত্য ও প্রতিশোধস্পৃহাকে ব্যবহার করে তাকে মুসলিমবিশ্বে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা, যেটা হয়েছিল আফগানিস্তান। আফগানিস্তানে অ্যামেরিকা এমন একটি যুদ্ধে আটকে আছে, যেটা সে না গিলতে পারছে আর না ফেলতে পারছে। সে সম্পূর্ণভাবে সর্বাত্মক যুদ্ধে যেতে চাচ্ছে না। কারণ, এটা অ্যামেরিকার জেনারেল ও নীতিনির্ধারকদের চিন্তাভাবনা, দর্শন ও আদর্শের একধরনের খাসীকরণ। এরা যুদ্ধে জিততে চায়; কিন্তু রক্ত, ধ্বংস আর জীবন দিয়ে যুদ্ধজয়ের মূল্য দিতে চায় না। তারা চায় দ্রুত বিজয়। তারা চায় ময়দানে নেমে কাপড়ে ময়লা না লাগিয়েই জিতে যেতে। তাই তারা দালাল সেনাবাহিনী, নির্বিচার বিমান ও ড্রোন হামলা ও নিজেদের স্বল্পসংখ্যক সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে সীমিত পরিসরের যুদ্ধের মাধ্যমে এ যুদ্ধে বিজয়ী হতে চায়; কিন্তু এ সীমিত পরিসরের যুদ্ধ দিয়ে তারা কোনোভাবেই জিততে পারছে না।

অ্যামেরিকা নিজের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে ইরাক আক্রমণ করে ও সেখানে হেরে। এখন চাইলেও তারা সরাসরি ইরাক বা সিরিয়াতে ঢুকতে পারছে না। অর্থাৎ, অ্যামেরিকার মূল ভূখণ্ড তথা কেন্দ্র থেকে দূরে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নীতির অক্ষমতা এ ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। অথচ একসময় মুসলিম উম্মাহ মনে করত, অ্যামেরিকা চাইলে পৃথিবীর যেকোনো জায়গা দখল করে নিতে পারে, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে। আজও অনেকে এমন মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অ্যামেরিকার ক্ষমতার মায়াজাল আফগানিস্তান, ইরাক ও শামে ভেঙ্গে গেছে।

এ আগ্রাসনগুলোর কারণে অ্যামেরিকা প্রথমত বিশ্বব্যাপী জিহাদি তানজিমগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় ফাঁদটির জন্য আবশ্যক হলো, অ্যামেরিকা ও ইসরাইলকে ক্রমাগত সারা পৃথিবীজুড়ে বিভিন্নভাবে আক্রমণের নিশানা বানানো। গাজওয়া ম্যানহাটনের অগ্রবর্তী দলের মতো হাজারটি দল যদি অ্যামেরিকাকে তার দেশের ভেতরে (যেমন, আব্দুল হাকিম মুহাম্মাদ, ফোর্ট হুড, বস্টন, চ্যাটানুগা, স্যান বার্নাডিনো) এবং দেশের বাইরে (২০০২ খ্রিষ্টাব্দে করাচিতে অ্যামেরিকান কন্সুলেটে হামলা, রিয়াদ ও জেদ্দা বোম্বিং, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামেনে অ্যাম্বেসিতে হামলা, মুম্বাই অ্যাটাক, বেনগাজি) হামলার শিকার বানায়। তবে অ্যামেরিকা কোনো একটি দেশ পাবে না, যাকে সে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারবে; আর না সে পারবে একসঙ্গে সবগুলো দেশে আক্রমণ করতে; বরং অ্যামেরিকা এই উপসংহারে আসবে যে, এ শত্রু এক অশরীরী শক্তির মতো, যে একইসঙ্গে একাধিক স্থানে অবস্থান করে। কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থানে এ শত্রু ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে না। ফলে এসব দেশের সরকারগুলো তাকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়।

যখন অ্যামেরিকা অনুধাবন করবে মুসলিমবিশ্বের তাগুত শাসকগোষ্ঠী তাকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়, তখন সে দুটো কাজের যেকোনো একটি করতে বাধ্য হবে।

১. হয় সে নিজে সরাসরি সামরিকভাবে ওই সব দেশে প্রবেশ করবে;

২. অথবা অ্যামেরিকা ওই সব দেশ থেকে তার স্বার্থ গুটিয়ে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করবে। এবং ওই সব দেশের এজেন্ট শাসকদের থেকে তার সমর্থন সরিয়ে নেবে, যেহেতু এখন এসব শাসকের থেকে তার পাবার আর কিছু নেই।

যদি অ্যামেরিকা প্রথম নম্বর অপশন বেছে নেয়, তবে এসব অঞ্চলে উপস্থিত তার সেনা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের মুখোমুখি অবস্থান দাঁড় করিয়ে দেবে। যদি নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে অ্যামেরিকা কোনো অঞ্চলে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়, তবে শুধু অ্যামেরিকার উপস্থিতিই সে অঞ্চলের মুসলিম যুবকদের মধ্যে, তাদের রক্তে আন্দোলনের সৃষ্টি করবে।

হাজার হাজার মুসলিম যুবককে তখন আর কিছু বোঝাতে হবে না। তারা নিজের চোখেই দেখবে, অ্যামেরিকা তাদের শত্রু, অ্যামেরিকা আগ্রাসনকারী। একইসঙ্গে যদি অ্যামেরিকা সামরিকভাবে আগমন করে, তবে তা মুজাহিদদের সুবিধা ও অ্যামেরিকার অসুবিধাকে জ্যামিতিকহারে বাড়িয়ে দেবে। কারণ, যে ১০টি পয়েন্ট ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অ্যামেরিকার সামরিক উপস্থিতি প্রতিটির ক্ষেত্রেই মুজাহিদদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং প্রতিটির ক্ষেত্রেই অ্যামেরিকার জন্য সমস্যা বৃদ্ধি করবে।

Scanned by CamScanner

আর যদি অ্যামেরিকা ২ নম্বর অপশন বেছে নেয়, তবে মুজাহিদদের মূল উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি অর্জিত হবে। আর তা হলো মুসলিমবিশ্বের তাগুতগোষ্ঠী থেকে অ্যামেরিকার সমর্থন প্রত্যাহার ও মুসলিমবিশ্বে অ্যামেরিকার হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া।

ছয়. 4GW এবং বাংলাদেশ

ইতিহাস সাক্ষী, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না। ইতিহাস এ-ও সাক্ষী দেয়, সঠিক সিদ্ধান্তকে ঘটনার পর সঠিক বলে চেনা যতটা সহজ, ঘটনাপ্রবাহের সময় অধিকাংশের কাছে ব্যাপারটা সহজ হয় না।

মুসলিম উম্মাহর জিহাদ আন্দোলনের মূল ফোকাস অ্যামেরিকাকে বানানো নিয়ে এবং বিশেষভাবে ৯/১১ হামলার ব্যাপারে শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ. বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ বিরোধিতা শুধু জিহাদি আন্দোলনের বাইরের মুসলিমদের দিক থেকে আসেনি। জিহাদি আন্দোলনের ভেতর থেকেও এ বিরোধিতা এসেছিল। আঞ্চলিক জিহাদি সংগঠনগুলো শায়খ আবু হামজা উসামা ও তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদের এ নীতির বিরোধী ছিল, যদিও মুজাহিদ ভাই হিশেবে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। শায়খ আবু লাইস আল-লিবি রাহ. এবং তাঁর সাথিদের LIFG থেকে তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদে যোগ দেওয়ার ঘটনাপ্রবাহ থেকে এ ব্যাপারে LIFG-এর মনোভাবের আভাস মেলে।

LIFG ছাড়া অন্য অনেক আঞ্চলিক জিহাদি সংগঠনই শায়খের এ নীতির ব্যাপারে একমত ছিল না। খোদ তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদের সদস্য এবং বলয়ের অনেকেই অ্যামেরিকাকে মূল লক্ষ্যবস্তু বানানোর নীতির বিরোধিতা না করলেও এ হামলার বিরোধিতা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শায়খ সাইফ আল আদিল, শায়খ আবু হাফস আল মৌরিতানি, শায়খ আবু মুসআব আস সুরি প্রমুখ। শায়খদের এ বিরোধিতার কারণও ছিল; কিন্তু ইতিহাস শায়খ উসামার সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেছে। এবং যা ছিল পূর্বে একটি পরোক্ষ বাস্তবতা, সেই বৈশ্বিক জিহাদকে ৯/১১ প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় পরিণত করেছে। বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডার-জায়নিস্ট-মুরতাদ শাসক-অক্ষ তথা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের পরিকল্পনা মুজাহিদিন নেতৃবৃন্দ করেছিলেন, ৯/১১ হামলা তাকে বাস্তব রূপ দান করেছে। সফলতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

একইসঙ্গে ৯/১১-এর হামলা ও তার পরবর্তী প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে কার্যকারীভাবে

Scanned by CamScanner

বিশ্ব কুফরিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুজাহিদিন 4GW-কে যুদ্ধকৌশল হিশেবে গ্রহণ করেছে। তবে দুঃখজনকভাবে উম্মাহর বড় একটা অংশ এখনো হক-বাতিলের এ যুদ্ধের ধরন সম্পর্কে পুরানো ধারণা আঁকড়ে আছে। আমরা এমন অনেক ভাইকদেরই দেখি, যারা আল্লাহর ইচ্ছায় জিহাদের জজবা ধারণ করেন; কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলার ক্ষেত্রে তারা আধুনিক যুদ্ধের ধরন এবং কৌশল অনুধাবন করতে পারেন না। ঠিক কীভাবে তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদ এ যুদ্ধের ছক এঁকেছে এবং এ যুদ্ধ চালাচ্ছে, তারা তা বুঝতে ব্যর্থ হন। এটা অনেক আলিমদের মাঝেও দেখা যায়। আর ছাত্রশিবির/জামায়াত, হিজবুত তাহরির ইত্যাদির ভাইদের মধ্যে তো দেখা যায়ই। যে কারণে 'বোমা ফাটিয়ে গোপনে মানুষ হত্যা করে কীভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে' বা এ-জাতীয় বিভিন্ন কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই।

এ ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, এ যুদ্ধের ধরনটা তারা বুঝতে পারেননি। কোনো এক বিশাল ময়দানে দুটি বাহিনী মুখোমুখি হবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তারপর দিন শেষে বাহিনী দুটো নিজ নিজ ক্যাম্পে ফেরত যাবে—এমন অবস্থা বর্তমানে নেই। আল মালহামাতুল কুবরার আগে কখনো এমন অবস্থা হবে কি না আল্লাহই ভালো জানেন।

তাই চতুর্থ প্রজন্মের এ যুদ্ধের ধরন সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন। আর এর জন্য আমাদের কিছু বাস্তবতাকে প্রথমে স্বীকার করে নিতে হবে :

১. লোকসংখ্যা, অর্থ, অস্ত্র, মিডিয়া—এসকল ক্ষেত্রে মুজাহিদিন ও শত্রুর মাঝে শক্তির ভারসাম্যহীনতা আছে। এ প্রতিটি ক্ষেত্রে দাড়িপাল্লা শত্রুর দিকেই হেলে আছে।

২. ফিতনা এবং হত্যাকাণ্ড নিজ গায়ের ওপর এসে যাবার আগে অধিকাংশ মানুষই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবে। তাগুতগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমদের স্বভাবপ্রকৃতির মধ্যে যে বিকৃতি সাধনে সক্ষম হয়েছে, এটা তার ফল। যদি কেউ প্রমাণ চান তবে মিসর, লিবিয়া ও কাশমিরের দিকে তাকাতে পারেন। এত জুলুমের এসব অংশে মুসলিমদের বিশাল একটা অংশ, যাদের মধ্যে আলিম-উলামাও শামিল আছেন—স্বৈরশাসন, গোত্রীয় শাসন এবং গণতন্ত্রের শাসনের মধ্যেদিয়ে অর্থাৎ, Status quo/ বিদ্যমান বাস্তবতাকে জিইয়ে রেখে সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন। বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম হবে—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে প্রকৃতিগতভাবে

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশিরা যখন উক্ত ভূমিগুলোর বাসিন্দাদের তুলনায় নরম প্রকৃতির।

৩. বাংলাদেশ মুজাহিদিনের জন্য একটি বদ্ধ খাঁচার মতো। একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে মূল ঘাঁটি বানিয়ে (বা কোনো অঞ্চলকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে) সেখানে থেকে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার মতো স্থান ভৌগলিক ও জাতীয়-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটজনিত কারণে বাংলাদেশে নেই। এ কারণে যদি শুধু ১৯৭১-এর সৃষ্ট সীমান্ত অনুযায়ী ভূখণ্ডের কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে মুজাহিদিনের জন্য এ ভূখণ্ড একটি খাঁচার মতো। যেই ভাইয়েরা কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তারা এখন এ সত্য বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছেন। আল্লাহ সকলকে হেফাজত করুন। নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখুন।

৪. বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি মোকাবিলায় লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি এ ভূখণ্ডে এখনো তৈরি হয়নি এবং এ মোকাবিলার কার্যকারণ অনুধাবনের ক্ষমতা জনগণের নেই।

এসব বাস্তবতা অনুধাবনের পর যে জিনিসটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ বর্তমান সময়ে একমাত্র যে পদ্ধতিতে আল্লাহর ইচ্ছায় মুজাহিদিন কাজ করতে পারেন তা হলো 4GW-এর নীতিসমূহ নিজেদের কাজে এবং পরিকল্পনায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

> বিশেষজ্ঞদের মতে, চতুর্থ পর্যায়ের যুদ্ধ একটি নতুন ধরনের যুদ্ধ। এতে যুদ্ধ হবে মূলত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থানে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না। শুধু শত্রুর সামরিক স্থাপনা ও সেনাবাহিনীকে আঘাত করার মধ্যে এ যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং শত্রুদেশ বা জাতির সমাজও এ যুদ্ধের আওতায় পড়বে। এ যুদ্ধের একটি মূল লক্ষ্য হবে শত্রুর সেনাবাহিনী বা যোদ্ধাদের প্রতি শত্রুর সমাজের যে সমর্থন, তা নষ্ট করে দেওয়া। এ কারণে এ যুদ্ধে ১০-২০ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার একটি ডিভিশনের চাইতে টিভি চ্যানেলগুলোর সংবাদ শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর কার্যকর অস্ত্র হিশেবে সাব্যস্ত হতে পারে।

এখান থেকে মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। জিহাদি মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক লেখাই আছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ মিডিয়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। জিহাদি মিডিয়ার

Scanned by CamScanner

একটি ভূমিকা মুজাহিদিনের খবর প্রচার করা। এর মাঝে আছে মুজাহিদিনের বক্তব্য, মানহাজ-সংক্রান্ত লেখা রচনা-বই-প্রবন্ধ, বিভিন্ন জিহাদি ময়দানের খবর ইত্যাদি। এ বিষয়টা আমরা সবাই বুঝি; কিন্তু জিহাদি মিডিয়ার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। আর তা হলো, জনগণের চিন্তাকে পরিবর্তন করা। জনগণের চিন্তাকে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করা। জনগণের চিন্তাকে আকার দেওয়া।

আমরা যখন জিহাদি মানহাজের সবচেয়ে সফল দায়ি শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি রাহ.-এর উদাহরণের দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই শায়খের সর্বাধিক প্রচারিত এবং কার্যকর লেকচারগুলোর ৯০% সরাসরি জিহাদ নিয়ে না। যদিও এগুলোর মধ্যে জিহাদের দিকনির্দেশনা প্রোথিত। এমনকি শায়খের *মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, আল্লাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন, State of the Ummah* এমনকি *Dust will Never Settle Down*-এর মতো লেকচারগুলোতেও সরাসরি ময়দানের কথা বলা হয় না।

অর্থাৎ, মিডিয়ার কাজ কেবলই সরাসরি জিহাদের ময়দানের খবর কিংবা গ্লোবাল জিহাদিদের বক্তব্য প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ওই চিন্তাধারার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করাও জরুরি, যা মানুষকে ময়দানের দিকনির্দেশনা দেবে। জিহাদি মিডিয়ার কাজ যদি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রভাব অর্জন করা কঠিন হবে। এ কারণে শুধুমাত্র খোরাসান, শাম কিংবা সোমালিয়ার খবর প্রচার এ নিষ্ক্রিয় জনতাকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে কতটুকু ফলপ্রসূ, তা আমাদের চিন্তা করতে হবে। একইভাবে চলমান ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মুজাহিদিনের দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের সামনে তুলে ধরাটাও গুরুত্বপূর্ণ, যাতে করে জনগণ মুজাহিদিনের চোখে বাস্তবতাকে দেখতে শেখে।

আমাদের বুঝতে হবে আমাদের মূল দর্শক বা পাঠক কারা। কারণ, এর ওপরই নির্ভর করবে আমাদের প্রচারণার ধরন, বিষয়বস্তু ও ভাষা। সব শ্রেণির দর্শকের জন্য একই ধাচের জিনিস উপযুক্ত নয়। যারা ইতিমধ্যে মানহাজ বুঝেছে, তারাই কি আমাদের একমাত্র টার্গেট অডিয়েন্স? যাঁদেরকে সক্রিয়ভাবে কাজে শামিল করতে চাই, তারাই কি আমাদের একমাত্র অডিয়েন্স? নাকি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মুজাহিদিনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় সমর্থনের দিকে নিয়ে আসাও আমাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত? বিশেষ করে আমাদের বৃহত্তর আলিমসমাজ যখন নিষ্ক্রিয়তার ও নীরবতার নীতি গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের মূল কৌশলগত ফোকাস হবে শত্রুর মনস্তত্ত্বের

Scanned by CamScanner

ওপর এবং প্রতিপক্ষের সামরিক নীতিনির্ধারক ও কৌশলবিদদের চিন্তাকে প্রভাবিত করার ওপর। কেবলই যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধবিন্যাস না, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভূমিকা পালন করবে মিডিয়া এবং সকল ধরনের ইনফরমেশান নেটওয়ার্ক। এগুলোর উদ্দেশ্য হবে প্রতিপক্ষ দেশ বা জাতির সাধারণ জনগণ ও অভিজাতশ্রেণির চিন্তাকে, জনমতকে প্রভাবিত করা।

জনমতকে প্রভাবিত করার কাজে যদি আল্লাহর ইচ্ছায় সফলতা আসে তাহলে অধিকাংশ জনগণ যদি নিষ্ক্রিয়ও থাকে, তবুও তারা নিষ্ক্রিয় সমর্থক হিশেবে থাকবে। যেমনটা শাতিমদের হত্যাকাণ্ডের সময় আমরা দেখেছি। কিন্তু জামাতুল বাগদাদির হঠকারী হামলার পর এ নিষ্ক্রিয় সমর্থন বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সক্রিয় বিরোধিতায় রূপ নিয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রেও মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শত্রুর মিডিয়া জনগণের মধ্যে সফলভাবে ভয় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা আরও দাবি করলেন, একটা বিশাল ময়দানে বা কোনো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সামনাসামনি যুদ্ধের বদলে এ যুদ্ধ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। আর এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হবে ভূতের মতো। যার আবির্ভাব ঘটবে হঠাৎ, আবার হঠাৎ করেই সে মিলিয়ে যাবে। একই সময় একাধিক জায়গায় যার উদয় হবে আবার তাকে ধাওয়া করতে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যাবে। এ যুদ্ধের ফোকাস হবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক। এ যুদ্ধ হবে সর্বব্যাপী।

এটি 4GW-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই দ্রুতগতির ফলেই শত্রুর বিশাল আকার ও ওজনকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষের জন্য শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবির্ভাব ও মিলিয়ে যাবার সক্ষমতা ছাড়া যদি আঘাত হানা হয় তবে শক্তিশালী শত্রু আপনাকে পিষে ফেলবে। অর্থাৎ, সময়ের আগে সম্প্রসারণের নীতি জিহাদি আন্দোলনের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে। প্রমাণ, বাংলাদেশে জামাআতুল বাগদাদির বর্তমান অবস্থা।

জামাআতুল বাগদাদি অতি দ্রুত তাদের আক্রমণকে এমন মাত্রায় উন্নীত করেছে, যখন সরকার বাধ্য হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পূর্ণ ওজন নিয়ে তার ওপর চেপে বসতে। আর জামাতুল বাগদাদি এ কাজটা করেছে প্রয়োজনীয় জনসমর্থন ও নিজেদের

Scanned by CamScanner

সাংগঠনিক চেইনকে নিরাপদ করা ছাড়াই এবং আবির্ভাব ও মিলিয়ে যাবার সক্ষমতা অর্জন ছাড়াই। সোজা বাংলায়, প্রস্তুতি ছাড়াই তারা এমন আক্রমণ করেছে, যার ধাক্কা সামাল দেওয়ার কোনো উপযুক্ত পরিকল্পনাই তাদের ছিল না।

এই যে আবির্ভাব ও মিলিয়ে যাবার সক্ষমতা, এটা অনেকাংশেই নির্ভর করে মুজাহিদিনের প্রতি জনসমর্থন এবং নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির ওপর। পক্ষান্তরে এ দুটো বিষয় নির্ভর করে মুজাহিদিনের দাওয়াতি কাজ তথা মিডিয়ার ওপর। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট, ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং মুজাহিদিনের শক্তি ও সামর্থ্যের নির্মোহ বিশ্লেষণের পর বোঝা যায় এই তিনটি ক্ষেত্রে—জনসমর্থন, নেটওয়ার্ক ও মিডিয়া বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার সফলতা এখনো অর্জিত হয়নি। আর বাংলাদেশের বাস্তবতার কারণে এ ফ্যাক্টগুলোকে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে বাংলাদেশ মুজাহিদিনের জন্য খাঁচায় পরিণত হবে। যেমনটা জামাআতুল বাগদাদির কর্মকাণ্ডের ফল হিশেবে আমরা দেখছি।

এ অবস্থায় কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের সময় এবং ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াহ এবং কাজের সময় এ বিষয়গুলো বিবেচনা করা আবশ্যক—বিশেষভাবে মিডিয়ার দিকটি। সময় ও সক্ষমতাসম্পন্ন সকল ভাইয়ের উচিত এ কাজের ব্যাপারে ফিকির করা ও সাধ্যমতো কাজ করা। আর মুজাহিদিনের মিডিয়ার কাজ যেন কেবলই সরাসরি জিহাদের খবরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, সেদিকেও আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

যুদ্ধ ক্রমপরিবর্তনশীল। যুদ্ধের নিয়মই এই যে, দিনসমূহ আবর্তিত হতে থাকে; আর গতিশীল যুদ্ধে স্থবিরতা বিপর্যয় ডেকে আনে। তা কৌশলের দিক থেকে হোক কিংবা চিন্তার। আমাদের শত্রুকে টেক্কা দিতে হবে সবরের দিক দিয়ে এবং কৌশলের দিক দিয়ে। শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ. উম্মাহর জিহাদ আন্দোলনের বৈশ্বিক পুনর্জাগরণের সঠিক নির্দেশনা দানে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছায় সঠিক সময়ে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আল্লাহ যেন এ ভূমির মুজাহিদিনকে সে তাওফিক দান করেন। আমিন।

Scanned by CamScanner

নিকটবর্তী শত্রুর ধোঁকা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾

তারা যদি চুক্তি সম্পন্ন করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের নিন্দা করে, তবে কুফরের এ সকল নেতৃবর্গের সঙ্গে এই আশায় যুদ্ধ করো যে, তারা হয়তো নিরস্ত হবে। বস্তুত এরা এমন লোক, যাদের প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই। [সুরা তাওবা : ১২]

তিনি আরও বলছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾

হে ইমানদারগণ, কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন। [সুরা তাওবা : ১২৩]

বর্তমানে আয়িম্মাতুল কুফর (কুফরের নেতৃবর্গ) কারা, যাদের ব্যাপারে বর্তমানে সকলে একমত? কারা সেই নেতৃস্থানীয় প্রধান, যারা সকল মানুষের কলকাঠি নাড়ছে? যারা টিকে থাকলে কুফরের দাওয়াত টিকে থাকবে এবং যারা ধ্বংস হয়ে গেলে কুফরের দাওয়াত ধ্বংস হয়ে যাবে? তারা হলো অ্যামেরিকা এবং তার মদদপুষ্ট ইসরাইল ও ভারত। সচেতন কেউই এ ব্যাপারে সন্দেহ করবে না।

তাই আপনারা যখন বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি বুলাবেন যে, কোনো পরাশক্তি সকল মানুষকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে জড়ো করছে, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ

Scanned by CamScanner

করছে, তখন দেখবেন সে অ্যামেরিকা ছাড়া আর কেউ নয়। এটা একটি বাস্তব বিষয়। সকলের মনে বদ্ধমূল একটা বিষয়। এটা বড় মনে করা বা সম্মান করা নয়; বরং এটা একটা স্বীকার্য বাস্তবতা।

এর উদাহরণ হতে পারে, আমাদের নিকট কুরাইশও আছে; আবার আমাদের নিকট গাতফানও আছে। তো আমরা কুরাইশ সম্পর্কে কথা বলছি।

তাহলে আয়িম্মাতুল কুফর কারা—এটা আমরা জানতে পারলাম। এখন যদি আমি এই অঞ্চল সম্পর্কে কথা বলতে চাই, তাহলে আয়িম্মাতুল কুফরকে এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ করে ফেলব; কিন্তু যখন যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলব, আর বর্তমানে তো পুরো পৃথিবীর যুদ্ধকে একটি যুদ্ধ হিশেবে গণ্য করা হয়, তখন দূরবর্তীরাও নিকটবর্তী হয়ে যাবে। এখন যদি আমি এসে হাজরামাউতের একটি কোণাকে নির্বাচন করি এবং আমার সকল কর্ম ও সকল জিহাদকে এই অঞ্চলের ওপরই নির্ভরশীল করি, তাহলে এটা ভুল হবে। কোথায় উম্মাহর দেহ, 'যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে তার জন্য সমস্ত দেহে জ্বর ও অনিদ্রার মাধ্যমে সাড়া পড়ে যাবে'?

আমরা এক জাতি। যে ওখানে আছে, সে-ই হুবহু এখানেও আছে। যখন আমি আমার নিজের প্রতি দেখব, তখন আমি ভূ-সীমায় বিশ্বাস করব। তখন আমি নিজেকে উম্মাহ থেকে পৃথক করে ফেললাম, নিজেকে যুদ্ধ থেকে পৃথক করে ফেললাম।

বর্তমানে আহলুস সুন্নাহর অবস্থা : উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে ইয়ামেনে হুথিরা দুর্বল; কিন্তু তাদের নেতৃত্ব একক। ফলে তারা সকল স্থানে লড়াই পরিচালনা করতে পারছে। আহলুস সুন্নাহর অনুসারী অনেক, তাদের সামনে সম্ভাবনা অনেক; কিন্তু তাদের পরিচালনাকারী একক নেতৃত্ব নেই। ফলে এক পক্ষ দলীয় শক্তিতে কাজ করে; আর অপর পক্ষ শুধু নিজস্ব শক্তিতে কাজ করে। অর্থাৎ, শুধু যেই গোত্রটি লড়াই করছে, তারা একাই কাজ করছে।

বর্তমানে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী যেহেতু একটি যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে, আর আমরাও সকল আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে আমাদের শত্রু চিহ্নিত করতে চাচ্ছি, সুতরাং দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলতে হয়, এই উম্মাহর মূল শত্রু হচ্ছে অ্যামেরিকানরা। শত্রু চিহ্নিত করার প্রসঙ্গ আসলে শরয়িভাবেই আমাদের জন্য আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখা বৈধ হবে না; বরং দেখতে হবে উম্মাহর দৃষ্টিতে।

আমার জন্য শুধু নিজের দৃষ্টিতে দেখা জায়িজ নেই; বরং দেখতে হবে উম্মাহর দৃষ্টিতে।

Scanned by CamScanner

আমি উম্মাহর হককে নিজের হকের ওপর প্রাধান্য দেবো। যখন আমি নিজের হককে উম্মাহর হকের ওপর প্রাধান্য দেবো, তখন আমি জালিম বলে বিবেচিত হব। আমি শরয়ি গুনাহে লিপ্ত বলে ধর্তব্য হব।

এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, একটা পরিপূর্ণ যুদ্ধের দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের প্রথম শত্রু হলো আয়িম্মাতুল কুফর (কুফরের নেতৃবর্গ) অ্যামেরিকানরা। তারপর ধারাবাহিকভাবে অন্যরা। এই হলো আয়িম্মাতুল কুফর। এবার দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমাদের নিকটবর্তী কুফফার কারা?

উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে যারা ইয়ামেনে আছে, তাদের উপর হামলা পরিচালনা করছে আব্দে রাব্বিহি; কিন্তু তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও শক্তিহীন। ফলে কখনো সে মারে, আবার কখনো মুজাহিদদের হাতে মার খায়। তো প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর শক্ত আঘাত হানছে এই আবদে রাব্বিহি নয়; বরং তার অন্তরালে থাকা অ্যামেরিকা। এটাই বাস্তবতা।

সুতরাং কার্যত কে তাদের অধিক নিকটবর্তী? আবদে রাব্বিহি নাকি অ্যামেরিকা? একবার এক তালেবান নেতাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কুরআনে তো নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এর আলোকে তো উচিত ছিল, আপনাদের মূল লড়াই হবে হামিদ কারজাইর বাহিনীর বিরুদ্ধে; কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনাদের মূল লড়াই অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে।' এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'দেখো, হামিদ কারজাই থাকে রাজধানী কাবুলে; কিন্তু অ্যামেরিকার বিমান তো অবস্থান করে আমাদের মাথার কয়েক কিলোমিটারের ভেতরে। এবার বলো, কার্যত আমাদের নিকটবর্তী কারা?'

সারা পৃথিবীর বাস্তবতার দিকে তাকালে যে-কেউ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, যেমনিভাবে আয়িম্মাতুল কুফর অ্যামেরিকানরা, একইভাবে কার্যত মুজাহিদদের নিকটবর্তী শত্রুও তারা। কারণ, দেশীয় তাগুতরা তার সমর্থন ছাড়া কোনোভাবে ক্ষমতায় টিকতে পারে না। দেশীয় তাগুতরা মুসলমানদের বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য কোনো অবস্থানও নিতে পারে না। নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ে এই অ্যামেরিকাই। সে-ই থাকে সবক্ষেত্রে নাটের গুরুর ভূমিকায়।

সুতরাং এখন যখন আমাদের যুদ্ধ হবে, তখন আমরা কি মাথার সঙ্গে যুদ্ধ করব, নাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব? যখন আমি ও আমার একজন শত্রু যুদ্ধে লিপ্ত হব, তখন আমি তাকে কোথায় আঘাত করে হত্যা করব? আমি কি তাকে হত্যার

Scanned by CamScanner

সম্ভাব্য স্থানে আঘাত করব, নাকি তার পায়ে আঘাত করব? আমি যদি তাকে বন্দি করতে চাই, তবে হাতের উপযুক্ত স্থানে আঘাত করব। আর যদি তাকে খতম করে দিতে চাই, তাহলে ঘাড়ের উপযুক্ত স্থানে তথা মৃত্যুর স্থানে আঘাত করব।

তাহলে কে প্রকৃতপক্ষেই ইয়ামেনিদের নিকটবর্তী? নিশ্চয়ই সে অ্যামেরিকা। আবদে রাব্বিহি বা অন্যান্যরা নয়; তারা তো হাতিয়ার মাত্র। আমরা যখন মুরতাদদের দিকে তাকাব, যারা তাদের শাসন করছে—দেখতে পাব তাদের সকল আইনকানুন, সকল প্রশাসন ও রাজনীতি কেন্দ্রীয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, নিরাপত্তাবলয় একটি।

সেখানে একটি নিরাপত্তা-কক্ষ রয়েছে। এরপর সেখান থেকে তা সকল আরব দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাদের জাতীয় নিরাপত্তার ভিত্তি অ্যামেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের অনুগামী। তাই প্রতিটি জিনিস তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর ভিত্তিও জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে। সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতিসহ সবকিছুর মূলই একটি।

সুতরাং প্রমাণিত হলো আয়িম্মাতুল কুফর (কুফরের নেতৃবর্গ) ও আমাদের নিকটবর্তী শত্রু একই।

আচ্ছা, এবার আসুন আমরা দ্বিতীয় রূপটির দিকে তাকাই। তা হলো আঘাত করার লড়াই ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লড়াই। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'আমরা যে যুদ্ধ করছি, এর দ্বারা কি আঘাত করে দুর্বল করা হচ্ছে, নাকি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে? এর উত্তর কী হবে?' আল্লাহ তাআলা নিজেই এর উত্তর দিয়ে দিয়েছেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

> তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত, যখন আর কোনো ফিতনা অবশিষ্ট থাকবে না এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। [সুরা আনফাল : ৩৯]

অর্থাৎ, আমাদের যুদ্ধের সর্বশেষ পরিণতি হবে, যেন দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় এবং আমরা সকলে শরয়ি শাসন দ্বারা শাসিত হব। তারপর আসবে কর্তৃত্ব। আঘাত করার মাধ্যমে দুর্বল করার মধ্যদিয়েই সর্বশেষে এ স্তরে পৌঁছা যাবে।

তাই এটা অযৌক্তিক যে, একজন এসেই বলবে, আমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ করব। এ তো রীতিমতো হাস্যকর কথা! কর্তৃত্বের যুদ্ধের সময় আসে ধাপে ধাপে। অনেকগুলো অভিযানের পরে। প্রতিদিন আপনার শত্রুকে আঘাত করতে করতে একটা পর্যায়ে

Scanned by CamScanner

এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন। তাই রাতারাতি বা দিনাদিন এ পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব নয়। এমনকি নবি ﷺ যখন মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন কি প্রথমেই তিনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ করেছেন, সাহাবিদের নিয়ে মক্কা দখল করতে গিয়েছেন? এটা অসম্ভব; বরং তিনি আট বছর পরে গিয়েছেন। প্রথম প্রথম শত্রুকে তার দুর্বল স্থানে আঘাত করেছেন।

শত্রুর দুর্বল স্থান অনুসন্ধান করে তাতে আঘাত করুন। তার শক্তিশালী স্থান খুঁজে তাতে আঘাত করতে যাবেন না। এটা ভুল। শত্রু সবচেয়ে দুর্বল হয় চলন্ত অবস্থায়। এ কারণেই রাসুল ﷺ তাদেরকে তাদের পথের মধ্যে, তাদের যাওয়ার পথে বা আসার পথে টার্গেট করেছেন।

নবি ﷺ বলেন,

ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا

> তোমরা নিক্ষেপ করো, আরোহণ করো। আর তোমাদের নিক্ষেপ করাই আমার নিকট আরোহণ করা অপেক্ষা উত্তম।[১৮]

তাই যদি আপনি শত্রুর ক্ষতি করেন, আর সে আপনার ক্ষতি করতে না পারে, তবে এটাই উত্তম; বরং এটাই আপনার ওপর ওয়াজিব। বিশেষ করে যখন আপনি জানবেন যে, সম্মুখ-লড়াই আপনার সাথিদের জন্য অনেক বিপদ্‌জনক।

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'নিক্ষেপ করো এবং আরোহণ করো।'

ঘোড়ায় আরোহণ করে তরবারি এবং বর্শার মাধ্যমে যুদ্ধ করা হয়; কিন্তু যদি দূর থেকে নিক্ষেপ করো, তাহলে শত্রুর ক্ষতিসাধন করতে পারবে।

এ জন্যই আল্লাহর বাণী,

﴿ وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾

> তোমরা তাদের জন্য সাধ্যমতো শক্তি প্রস্তুত করো... যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখবে। [সুরা আনফাল : ৬০]

-এর ব্যাখ্যায় নবি ﷺ বলেন, 'জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা।' এ কথাটি পরপর তিনবার বলেন।

---

১৮ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮১১

Scanned by CamScanner

আগের যুগে মানুষ সাধারণত তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করত, যার কারণে সকলেই তরবারি চালাতে পারত। সে সময় এমন অনেক মানুষও পাওয়া যেত, যারা তরবারি ভালো চালনা করতে পারে; কিন্তু তির চালাতে পারে না। অপরদিকে যারা ভালো তির চালাতে পারে, তাদের হাতে অবশ্যই তরবারিও থাকে, যাতে সেটা দিয়েও যুদ্ধ করতে পারে। পরিশেষে এটা সকলের অস্ত্র।

বর্তমান সময়ের বিবেচনায় যেমন কারও নিকট আরপিজি থাকলেও অবশ্যই তার কাছে ক্লাশিনকভ থাকে, যার মাধ্যমে সে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করে। নবি ﷺ যে বলছেন, 'জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা।' এটা মূলত এর গুরুত্বের কারণে।

নবি ﷺ সহিহ হাদিসে আরও বলেন, 'যুদ্ধ হলো ধোঁকা। অর্থাৎ, যুদ্ধের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধোঁকা।'

মুহাদ্দিসগণ বলেন, এখানে নবি ﷺ স্পষ্ট করছেন যে, সরাসরি ও মুখোমুখি যুদ্ধ করার চেয়ে ধোঁকার মাধ্যমে যুদ্ধ করাই উত্তম। কারণ, সরাসরি যুদ্ধে যেমন আমি শত্রুর ক্ষতি করি, তেমনি শত্রুও আমার ক্ষতি করে।

কিন্তু আমরা যদি এ আলোচনার মধ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ ও দুর্বল করার যুদ্ধের আলোচনায় ফিরে আসি তবে আমরা বলব, এখন আমাদের সামনে আছে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া, মাগরিব, ইয়ামেন, চেচনিয়া, সুদান প্রভৃতি। এর অনেকগুলো অঞ্চলই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। এমন কোনো অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল, যা ইসলামি শরিয়া দ্বারা শাসন করত। কিন্তু তারপর ফল কী হয়েছিল? আমাদেরকে অবশ্যই এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

ফল হলো, আফগানিস্তানে অ্যামেরিকা আসল। কয়েক দশক রাষ্ট্রকে একত্রিত করল। তারপর সকলে মিলে এই একটি দেশের উপর আক্রমণ করল। তারপর সকলে মিলে ইরাকে আক্রমণ করল, তারপর সিরিয়ায়, তারপর ইয়ামেনে, তারপর সোমালিয়ায়, এভাবে কতদিন পর্যন্ত এটা চলবে?

আমরা যখন আল্লাহ তাআলার এই স্পষ্ট আয়াতের দিকে ফিরব, তখন এর উত্তর পেয়ে যাব—

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾

আমাদের সামনে আছে ফিতনা, তথা কুফর ও শিরক।

﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

Scanned by CamScanner

তাই এই যুদ্ধের শেষ সীমা হলো ফিতনা শেষ হয়ে যাওয়া এবং দীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া। যখন ফিতনা শেষ হয়ে যাবে, তখনই দীন কায়েম হয়ে যাবে। তাওহিদের কালিমা থেকেও আমরা একই শিক্ষা পাই। 'لا إله إلا الله' 'কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া'। 'লা ইলাহা' বলার দ্বারা প্রথমে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্য ও সর্বপ্রকার তাগুতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, এরপর 'ইল্লাল্লাহ' বলার দ্বারা একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ হিশেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তো প্রথমে যখন ভেতরকে শিরকমুক্ত করা হয়, তখন তা তাওহিদের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে।

আমি এখানে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম, তারপর তারা সমবেতভাবে সেখানে এসে আঘাত করল। তারপর আমি আরেক জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলাম, তারা তাদের সকল শক্তি একত্রিত করে পুনরায় আক্রমণ করল। এভাবে কতকাল চলতে পারে?

আমরা কেন শরিয়ার নির্দেশের প্রতি লক্ষ রাখি না! আমাদেরকে এক দেহ হতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই আয়িম্মাতুল কুফরের প্রতি মনোনিবেশ করব, যারা আমাদের নিকটবর্তী তাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। আমরা সকলে তাদের আঘাত করব। তারা সবাই শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা প্রত্যেকে দাঁড়াব। যারা ইরাকে আছে তারা দাঁড়াবে, যারা আফগানিস্তানে আছে তারা দাঁড়াবে, যারা সিরিয়ায় আছে তারা দাঁড়াবে, যারা ইয়ামেনে আছে তারা দাঁড়াবে, মাগরিব ও সোমালিয়ায় যারা আছে সকলে দাঁড়াবে। তাই শিরকের সমাপ্তিই অনিবার্যরূপে ইসলামের প্রতিষ্ঠা।

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

আমরা চাই না শত্রুরা আমাদে ধোঁকা দিক। তারা তাদের পদ্ধতিতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক। আমাদেরকে ময়দানে বের করে আনুক। শত্রুরা তো সম্মুখযুদ্ধে পারদর্শী। কেন? কারণ, তাদের অনেক উপকরণ রয়েছে।

নবি ﷺ বলছেন, 'জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা।' তো তাদের নিকটও নিক্ষেপ-শক্তি রয়েছে। এখানে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করা হয়েছে।

আমাদেকে আদেশ করা হয়েছে নিক্ষেপের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। তাদের নিকট এমন উপকরণ রয়েছে, যা আমাদের নিকট নেই। তা ছাড়া আমরা উপকরণের ওপর ভরসাও করি না। কারণ, এর ওপর ভরসা করা শিরক। হ্যাঁ, উপকরণ পরিত্যাগ করাও আবার গুনাহ। তাই আমরা এর ওপর নির্ভরশীলও হয়ে পড়ব না; আবার তা একেবারে পরিত্যাগও করব না।

Scanned by CamScanner

আমাদের শত্রুরা সম্মুখযুদ্ধের পদ্ধতিটি ভালো পারে; আর আমরা ধোঁকা বা কৌশলের পদ্ধতিটি ভালো পারি। সুতরাং আমরা তাদেরকে আমাদের গণ্ডির ভেতর নিয়ে আসব এবং আমাদের পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এমনটা নয় যে, তারা আমাদেকে টেনে আনবে, আমাদেরকে টোপ দেবে। প্রতিদিন টোপ দিতে থাকবে যে, তোমরা উম্মাহর যুবক ও বাহাদুরদেরকে বের করো। তারপর যখনই ফল পেকে যেতে দেখবে, তখন তোমার জন্য একটি রূপরেখা আবিষ্কার করবে। তোমাকে টোপ দেবে।

যখনই আমরা শত্রুর সঙ্গে পরিপূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে যুদ্ধ করি, তখনই দেখা যায় একটা পর্যায়ে এসে আচমকা আমরা পথ থেকে সরে পড়ি। আমাদের ভেতরেই থাকে বিভিন্ন গোপন শত্রু; আবার বাহির থেকেও শত্রু এসে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাহলে এটা মূলত সরে পড়া নয়; বরং টোপের মুখে পড়া। আমাদের ওপর আবশ্যক হলো, আমরাই তাদেরকে টোপে ফেলব। আমরা তাদেরকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে দেবো না।

দেখুন, শত্রুরা কিছু ব্যক্তির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। তারা চাচ্ছে যেকোনো উপায়ে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন করে দিতে। তারা আমাদেরকে সম্মুখযুদ্ধে আনতে চাচ্ছে। এ কারণেই কোনো একটা অঞ্চল দখল করে তাড়াহুড়োর সঙ্গে ইমারাহ ঘোষণা দিয়ে বসা কোনোভাবেই আমাদের জন্য সংগত নয়। আইসিসের মতো খিলাফাহ তো আরও দূরের কথা!

তা ছাড়া আমরা এখন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আছি। আমাদের জন্য শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে হবে। এটাই আমাদের মাঝে ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাঝে বাধা হয়ে আছে। যখনই কোনো স্থানে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই শত্রুরা এসে তা ধ্বংস করে দিয়েছে। এ জন্য এখন প্রথমে এই প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে।

তাহলে বোঝা গেল, হুটহাট দাবি করা এবং ফল আহরণ করতে চাওয়ার মানে হলো ফল নষ্ট করা। খুব আবেগ প্রদর্শন করে ইসলামি বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলাম কয়েক মাস বা কয়েক বছর। তারপর? এটাই কি আমাদের থেকে কাম্য? না, বরং আমরা শত্রুকে প্রতিহত করব। সে-ই তো আমাদেরকে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দিচ্ছে।

এমনটা বলবেন না যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করব। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করবেন এভাবে যে, আপনি সেই বাধা প্রতিহত করবেন, যা শরিয়ত প্রতিষ্ঠা

Scanned by CamScanner

করতে বাধা দিচ্ছে। তাই আপনার ওপর আবশ্যক হলো, আপনি তাকে ধ্বংস করবেন—এমন নয় যে, তার নিকট আত্মসমর্পণ করে, তারপর একটি কোণা বেছে নিয়ে তাতে শরয়ি হুকুম বাস্তবায়ন করবেন।

আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা কি শরয়ি হুকুমের অংশ নয়? ইমানের পর তার থেকে বড় ওয়াজিব কিছুই নেই, যেমনটা শায়খুল ইসলাম বলেছেন। প্রত্যক্ষ কাজ হলো, আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা। কিন্তু আপনি দারুল হরবে হুদুদ কায়েম করতে আসলেন! যাইহোক, তখন আমি আপনাকে বলব, আপনি তো কথার মাধ্যমে এটা অবলম্বন করলেন; কিন্তু শত্রু তো এখানেই? তাহলে আপনি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বাদ দিয়ে সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত হলেন!

অর্থাৎ, এটা একটি ওয়াজিব। আর ওয়াজিব থেকে ভিন্ন কাজে ব্যস্ত হওয়া মানে তাকে অবহেলা করা। আপনি এই ওয়াজিবটি ছেড়ে দিলেন। আপনি যতই আমল করেন; কিন্তু আপনি একটি ওয়াজিবে অবহেলা করলেন।

সবশেষে আমরা ফিরে যাই শত্রুর মাসআলায়। শত্রু দুই ধরনের, একটি হলো ভেতরগত শত্রু, আরেকটি হলো বহির্শত্রু। একটি হলো নিকটবর্তী শত্রু, আরেকটি হলো দূরবর্তী শত্রু। গুরুত্বপূর্ণ কোনটা? গুরুত্বপূর্ণ সেটাই, যেটা আমাদের ওপর আঘাত করছে। তারা হলো আয়িম্মাতুল কুফর, তারা আমাদের নিকটবর্তীও। আর এই শত্রুই আমাদের মাঝে ও আমাদের শরিয়ার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। হ্যাঁ, অ্যামেরিকানরা আমাদের জন্য অনেক শত্রু সৃষ্টি করছে, যাতে আমাদেরকে তাদের থেকে অমনোযোগী রাখতে পারে এবং লড়াই আমাদের দেশে স্থানান্তর করতে পারে, ফলে তাদের দেশে লড়াইয়ের বিষয়টি আড়ালে থেকে যায়। কিন্তু আমাদেরকে তো এই ফাঁদে পা দিলে চলবে না। কারণ, মুমিন এক গর্তে দু-বার দংশিত হয় না।

Scanned by CamScanner

গ্লোবাল জিহাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বর্তমানে সারা পৃথিবীজুড়ে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হলো খিলাফাহ না থাকা এবং জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ, আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি কেন্দ্রিক সৃষ্ট অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সর্বত্র ছড়িয়ে যাওয়া। যার কারণে এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো সকল সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন ছিন্ন করে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কথা হলো খিলাফাহ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? এর মানহাজ ও পদ্ধতি কী হবে? এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন মতাদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড) এবং তাদের সমমনা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।

২. হিজবুত তাহরির।

৩. হামাস (ফিলিস্তিন), লস্কর-ই-তায়্যিবা (পাকিস্তান), জেএমবি (বাংলাদেশ) ইত্যাদি আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের জিহাদি কার্যক্রম নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৪. জামাআতুল বাগদাদি আইসিস এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআত।

৫. তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদ।

এর বাইরে আরও আছে :

১. তাবলিগ জামাআত।

২. শায়খ আলবানি রাহ. প্রচারিত সালাফি দাওয়াত।

এদের সকলেরই দাবি তারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে তাবলিগ জামাআত এবং সালাফি দাওয়াতের বক্তব্য হলো, ইসলাহ ও তারবিয়াতের

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাবলিগ জামাআত বলে, সব মুসলমান যদি ছয় সিফাতের ওপর ওঠে এবং নিয়মিত পাঁচ কাজ করে, বেশি থেকে বেশি জামাআতের খুরুজ হয়, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খিলাফাহ ফিরে আসবে। সালাফি দাওয়াতের বক্তব্য হলো, সব মুসলমান যদি আশারি-মাতুরিদি-দেওবন্দি আকিদা ছেড়ে আসারি সহিহ আকিদা গ্রহণ করে, শিরক কুফর ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকে এবং দীনের ব্যাপারে সালাফে সালিহিনের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা গ্রহণ করে, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খিলাফাহ ফিরে আসবে।

বাস্তবতার নিরিখে বলতে হয়, এ দুটো পদ্ধতি সমাজ সংস্কারের জন্য একটা পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে; কিন্তু কখনোই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হতে পারে না। কেবলই ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। না মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে আর না সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এর কোনো নজির আছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড) ও জামায়াতে ইসলামী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে দীন কায়েমের কথা বলে। অর্থাৎ, সমাজে দাওয়াতের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। উপযুক্ত সময়ে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা হবে। অবশ্য তারাও গণতন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, ইখওয়ান ও জামায়াতে ইসলামী সায়্যিদ কুতুব রাহ.-এর আদর্শের দাবিদার হলেও মূলত তারা তার আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এমনকি সশস্ত্র যুদ্ধ-জিহাদ ফরজে আইন হওয়াকেও তারা মানতে চায় না। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ভুল-বিকৃতি তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মডারেট ইসলামের অনেক চিহ্ন ও প্রভাবও তাদের মধ্যে চোখে পড়ে।

হিজবুত তাহরিরও মূলত সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শী। তবে তারা সশস্ত্র জিহাদকে ফরজ বলে; কিন্তু বাস্তবজীবনে তারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। তাদের মতাদর্শ হলো, জনসাধারণকে খিলাফাহর গুরুত্ব বোঝানোর মাধ্যমে খিলাফাহর পক্ষে সোচ্চার করে তোলা হবে। এরপর সামরিক বাহিনীর কাছে নুসরত (সাহায্য) চাওয়া হবে। তারা নুসরত করলে ক্ষমতা দখল করে খিলাফাহ ঘোষণা দেওয়া হবে। একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থাকবে, যারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শাখার কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পলিসি ঠিক করবে। আর নুসরত না-পাওয়া গেলে দাওয়াতের কাজ চলবে, তবে সশস্ত্র জিহাদে যাওয়া যাবে না। এভাবে তারা মুখে জিহাদ ফরজে আইন বললেও কার্যত তা পরিত্যাগ করেছে।

Scanned by CamScanner

হামাস, লস্কর-ই-তায়্যিবা, জেএমবি ইত্যাদি আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের জিহাদি কার্যক্রম নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাদের অভিমত হলো, নিজ নিজ মুসলিম ভূখণ্ডের তাগুত ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীকে; কিংবা দখলদার কাফিরে আসলি (মৌলিক কাফির; রিভার্টেড বা মুরতাদ নয়) যারা, তাদেরকে জিহাদের মাধ্যমে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করা হবে, এরপর শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা হবে, নিকটবর্তী শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদও পরিচালনা করা হবে।

উল্লেখ্য, হামাস ও লস্কর-ই-তায়্যিবার সূচনা মূলত এই আদর্শের ওপর হলেও তারা পরবর্তীতে এই আদর্শ ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক ধারায় অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই আদি ধারাটি প্রায় বিলুপ্ত।

জামাআতুল বাগদাদি আইসিস এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআতের অভিমত হলো, প্রথমে একটি ভূমি দখল করা হবে, যা সেইফ জোন [Safe Zone] হিশেবে কাজ করবে এবং একজন আমির নিযুক্ত করে তাকে 'খলিফা' ঘোষণা করা হবে। তার নেতৃত্বে নিকটবর্তী শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে অঞ্চল দখল করা হবে এবং সেখানে শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা হবে। এরপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে বায়আত দাবি করা হবে। তাদের নিযুক্ত খলিফাকে বায়আত দেওয়া তারা সকল মুসলিমের ওপর ফরজ মনে করে থাকে। এমনকি যারা বায়আত দেবে না, তাদেরকে মুরতাদ ও মুনাফিক মনে করে। তাদের রক্ত হালাল মনে করে।

মূলত এই পদ্ধতিটি হলো প্রথমে খিলাফাহ ও খলিফা ঘোষণা, এরপর এই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। এই ঘোষিত খিলাফাহ ও খলিফার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে মুসলিমদের ইমান ও কুফরের বিচার করা।

তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রথমে একটি অগ্রগামী দল তৈরি করা হবে, যাদের কাজ হবে 'সাপের মাথা' তথা বৈশ্বিক কুফরিশক্তির কেন্দ্র অ্যামেরিকাকে এবং পাশাপাশি পশ্চিমা অন্য শক্তিসমূহকে আক্রমণ করা। এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে; কিংবা যেসব সশস্ত্র জিহাদি জামাআত আছে, তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। এই সব দলকে বিশ্বব্যাপী একটি গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে একীভূত করতে হবে। এই আঞ্চলিক দলগুলো নিজ নিজ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবে। দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবে। মুসলিম উম্মাহর হারানো চেতনা জাগ্রত করবে এবং সবাইকে জিহাদের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে। মূল গেরিলাযুদ্ধ

Scanned by CamScanner

শুরু হওয়ার আগে তারা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা পপুলার সাপোর্ট বেস তৈরি করবে।

এরপর প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তারা ভূমি দখল করবে এবং সেখানে শরিয়া প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিটি শাখা মূল নেতৃত্বের নির্দেশনা মেনে চলবে। প্রয়োজনে অন্যান্য ইসলামি দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি দাওয়াতের কাজও চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে আঞ্চলিক তাগুত বা কুফফারকে যথেষ্ট দুর্বল করতে পারলে এবং পর্যাপ্ত ভূমি নিয়ন্ত্রণে আসলে ইমারাহ গঠন করবে।

একই সঙ্গে মূল শত্রু বৈশ্বিক কুফরিশক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। একটি শক্তিক্ষয়ের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে (Asymmetric war of attrition) কুফরের ধ্বজাধারী ও দাজ্জালি মিশন বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রসমূহকে জড়িয়ে রাখতে হবে। এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা নিঃশেষ করার মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বে সেসব রাষ্ট্রের সামরিক অভিযান চালানোর সক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে হবে।

এভাবে যখন বৈশ্বিক কুফরিশক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলো মুসলিমবিশ্বে আগ্রাসন চালাতে এবং সামরিকভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের তাগুতগোষ্ঠীকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে দাঁড়াবে, তখন শুরার মাধ্যমে, উম্মাহর আন্তরিক সন্তুষ্টি ও সম্মতির ভিত্তিতে খিলাফাহ ঘোষণা করা হবে।

এটা হলো দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোনো আঞ্চলিক ভূমি দখল করাই মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং আঞ্চলিক সংঘর্ষের চেয়ে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যসমূহই এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে এখানে আঞ্চলিক তাগুতের আগে কুফরের ইমামদের ধ্বংস করাই মূল উদ্দেশ্য হিশেবে বিবেচিত হয় এবং এর জন্য জনসমর্থনের ভিত্তিতে গেরিলাযুদ্ধকেই উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বাস্তবসমত পন্থা মনে করা হয়। এই মানহাজ শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ. প্রবর্তিত মানহাজ।

এক. খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রস্তাবিত পদ্ধতির কৌশলগত পর্যালোচনা এবং শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ.-এর পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব

১. রাজনৈতিক পদ্ধতি

Scanned by CamScanner

ইখওয়ান, জামায়াতে ইসলামী এবং হিজবুত তাহরির জিহাদ পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। কাজেই তাদের আন্দোলনের ভিত্তিই হচ্ছে একটি ফরজ ত্যাগের ওপর। ইখওয়ান এবং জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে কুফরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। হিজবুত তাহরির নুসরতের তলবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কাফির ও মুরতাদ-বাহিনীর দ্বারস্থ হচ্ছে। উভয় দলের এ কর্মকাণ্ড শরিয়া বহির্ভূত।

অধিকন্তু তাদের বিগত ইতিহাস খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার অনুকূল প্রমাণিত হয়নি। ইখওয়ান যখন ক্ষমতায় ছিল, জামায়াতে ইসলামী যখন ক্ষমতাসীন সরকারের জোটে ছিল, তখন তাদের ইতিহাস আমরা দেখেছি। তারা খিলাফাহ তো পরের কথা, স্থানীয়ভাবেও ইসলামি শরিয়া কায়েম করতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে দীন ইসলামকে তরলায়িত করে পশ্চিমা কুফরি মতাদর্শের সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা করেছে।

এসব বিষয় বাদ দিলেও তাদের গৃহীত পদ্ধতি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, ধরা যাক ইখওয়ান এবং জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিকভাবে এবং হিজবুত তাহরির নুসরত লাভের মাধ্যমে কোনো একটা দেশে ক্ষমতায় গেল, এরপর তারা যখন খিলাফাহ ঘোষণা করবে, তখন তাদেরকে নিচের কাজগুলো করতে হবে :

১. বিশ্বের সকল মুসলিমের হিজরতের জন্য দারুল খিলাফাহ তথা খিলাফাহর ভূমি উন্মুক্ত করে দিতে হবে। তাদের প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দিতে হবে। কারণ, খিলাফাহ কেবল একটা শব্দ নয়; বরং বাস্তবতা। এই বাস্তবতা ছাড়া কিছুতেই খিলাফাহ হতে পারে না।

২. ফিলিস্তিন, আরাকান, কাশমির, উইঘুর, ইয়ামেন, সিরিয়া ইত্যাদিসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নির্যাতিত মুসলমানদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মুক্ত করার জন্য সৈন্য ও অন্যান্য সাহায্য পাঠাতে হবে।

৩. বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ কায়েম করতে হলে বিশেষত মুসলিম ভূমিগুলোতে, ওই সব দেশের শাসকদের উৎখাত করতে হবে। ফলে খিলাফাহ কায়েমের জন্য তাদেরকে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। এমতাবস্থায় অ্যামেরিকাসহ বিশ্বের তাবৎ কুফরিশক্তি তাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। যদি তা না-ও করে, তবুও নিজ অঞ্চলে শরিয়া রাখতে হলে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। কারণ, অ্যামেরিকা কিছুতেই একটা ভূমিতে ইসলামি শরিয়া কায়েম রাখতে দেবে না।

Scanned by CamScanner

স্পষ্ট যে, অ্যামেরিকাসহ বিশ্বের সম্মিলিত কুফরিশক্তির মোকাবিলা করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তাদের নেই। ফলে অতি দ্রুতই অ্যামেরিকা তাদের ঘোষিত খিলাফাহ ধ্বংস করে দেবে। এরপর তারা যদি অ্যামেরিকার মোকাবিলায় দাঁড়াতে চায়, তাহলে তাদেরকে গেরিলাযুদ্ধের পথ গ্রহণ করতে হবে। তাদের খিলাফাহ তখন মুসলিম উম্মাহর আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবিক খিলাফাহর পরিবর্তে একটা গেরিলা দলে পরিণত হবে। শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ. যে গেরিলাযুদ্ধের পন্থা গ্রহণ করেছেন, অবশেষে তাদেরকে সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। উপরন্তু এভাবে খিলাফাহ ঘোষণা করে কদিন পরেই তা নিঃশেষ করে দেওয়ার দ্বারা মুসলিম উম্মাহর মনোবল ভেঙে যাবে। কাজেই শুরু থেকে গেরিলা পন্থা গ্রহণ করাই বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হচ্ছে, যেমনটা তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদের মানহাজ।

২. সশস্ত্র-পদ্ধতি

সশস্ত্র পদ্ধতির মধ্যে আমরা তিনটা পদ্ধতি দেখছি :

ক. হামাস, লস্কর-ই-তায়্যিবা, জেএমবি ইত্যাদি আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের জিহাদি কার্যক্রম নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সফলতা পেলেও বাস্তবে মূলত তারা কোনো ভূখণ্ডেই তাগুত-কাফিরকে উৎখাত করে শরিয়া কায়েম করতে সক্ষম হয়নি। উলটো বরং তাগুত সরকারগুলো তাদের দমন করতে সক্ষম হয়েছে (যেমন, জেএমবি); অথবা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর তারা আর অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি (যেমন, মরো লিবারেশান ফ্রন্ট)।

সর্বোপরি এই পদ্ধতিটির ফোকাস আঞ্চলিক; কিন্তু খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হলো একটা বৈশ্বিক লক্ষ্য। যদি এই পদ্ধতিটি কোনো ভূখণ্ডে সফলও হয়, তবুও তার মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হবে না; বরং বেশির চেয়ে বেশি একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটা ইমারাহ প্রতিষ্ঠা হবে, যা কেবল তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলেই শরিয়া প্রতিষ্ঠা করবে।

খ. জামাআতুল বাগদাদি আইসিস এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআত, এদের মধ্যে বাগদাদির জামাআতই সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চল দখল করে আবু বকর বাগদাদিকে খলিফা ঘোষণা করেছিল। তাদের অঞ্চলকে দারুল খিলাফাহ ঘোষণা দিয়েছিল।

আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করে খিলাফাহ ঘোষণার পর ইখওয়ান, জামায়াতে ইসলামী এবং হিজবুত তাহরিরকে যে পরিস্থিতির শিকার হতে হবে বলে পূর্বে আলোচনা

Scanned by CamScanner

হয়েছে, তা এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাস্তবে তা ঘটেছেও। খিলাফাহ ঘোষণার অল্পদিন পরেই তারা অ্যামেরিকা ও পশ্চিমা কাফির এবং তাদের মিত্রদের দ্বারা ব্যাপক হামলার শিকার হয়েছে। একে একে হারাতে হারাতে তারা তাদের সবকটি ভূমিই হারিয়েছে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের নিরাপত্তা দেওয়া তো দূরের কথা, তারা নিজেদেরও রক্ষা করতে পারেনি। তাদের নেতাদের ধরে ধরে অ্যামেরিকা হত্যা করেছে। মুসলমানদেরকে পশ্চিমা কুফরিশক্তি এবং শিয়াদের রোষানলে পতিত করেছে।

অধিকন্তু তারা নিজেরা মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক রক্তপাত ঘটিয়েছে। মুসলমানদের তাকফির করে করে হত্যা করেছে। মুসলমানদের একতা-ঐক্য নষ্ট করে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এরকম একটি দলের নিজেদের খিলাফাহ দাবি করে তাদের বায়আতকে ফরজ দাবি করা বাস্তবতা বহির্ভূত বাগাড়ম্বর বৈ কিছু নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিটি পদ্ধতিতে শেষপর্যন্ত ঘুরেফিরে গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে ইমারাহ প্রতিষ্ঠার দিকেই যেতে হচ্ছে। আর এটাই হলো তৃতীয় সশস্ত্র পদ্ধতি তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদ বা শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ.-এর মানহাজ, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অতএব, খিলাফাহ কায়েমের লক্ষ্যে শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ.-এর মানহাজই শ্রেষ্ঠ, কার্যকারী, সফল এবং বাস্তবসম্মত প্রমাণিত।

৩. বৈশ্বিক জিহাদ এবং 'সাপের মাথায় আঘাত করা'র নীতি

জিহাদকে নির্দিষ্ট এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার ধারণা সর্বপ্রথম শহিদে উম্মাহ আবদুল্লাহ আজজাম রাহ. উপস্থাপন করেন। আফগান জিহাদের শেষদিকে যখন রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তখন শায়খ আবদুল্লাহ আজজাম রাহ. এবং তার অনুগত আরব মুজাহিদদের একটি অংশ জিহাদি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ., শায়খ আবু ফিরাস আস-সুরি রাহ., শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি, শায়খ আবু খালিদ আস-সুরি রাহ., শায়খ মুহাম্মাদ আতিফ রাহ., শায়খ সাইফ আল-আদিল, শায়খ মুহাম্মাদ ইসলামবুলি রাহ. (আনওয়ার সাদাতের হত্যাকারী মহান বীর খালিদ ইসলামবুলির ভাই), শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি এবং আরও অনেকে। এ-সকল বরেণ্য ব্যক্তিদের সবাই দুটি বিষয়ে একমত ছিলেন :

১. মুসলিম উম্মাহর উত্তরণের একমাত্র পথ জিহাদ।

২. আফগানিস্তানের মাটিকে জিহাদের জন্য একটি ঘাঁটি তথা লঞ্চিং প্যাড

Scanned by CamScanner

হিশেবে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মত ছিল।

শায়খ আবদুল্লাহ আজজামের চিন্তা ছিল, আফগানিস্তানের মাটিতে মুজাহিদদের একটা ঘাঁটি তৈরি করা, যাতে সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম যুবকরা এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে। তারপর নিজ দেশে ফিরে গিয়ে জিহাদ শুরু করবে। প্রয়োজনে তাদের আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি একটি অগ্রবর্তী দল গঠন করা হবে, যাদের কাজ হবে ফিলিস্তিনে গিয়ে ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং মুসলিমবিশ্বের যেখানেই মুসলিম নির্যাতিত হবে, আফগানিস্তানের মাটি থেকে এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদরা সেখানে গিয়ে মুসলমানদের সহায়তায় জিহাদ করবে।

আল-জিহাদ এবং জামাআতুল ইসলামিয়্যাহর মিসরীয় মুজাহিদদের চিন্তা ছিল মিনরের মুজাহিদদেরকে আফগানিস্তানের মাটিতে মিসরে জিহাদ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং একটি বাহিনী তৈরি করা হবে। এরপর জিহাদের মাধ্যমে মিসরের ক্ষমতা দখল করা হবে এবং মিসরকে ঘাঁটি হিশেবে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা হবে। আলজেরিয়া এবং লিবিয়ার মুজাহিদদের একই রকম পরিকল্পনা ছিল নিজ নিজ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু শায়খ আবু হামজা উসামা রাহ.-এর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। শায়খ মত ব্যক্ত করলেন, আফগানিস্তানের মাটিতে একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে। সারা বিশ্ব থেকে আসা মুসলিম যুবকদের এবং জিহাদি বিভিন্ন জামাআতের সদস্যদের সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নিজ নিজ ভূখণ্ডে জিহাদি কার্যক্রম চালানোর জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেওয়া হবে। নিপীড়িত মুসলিমদের সুরক্ষায় এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হবে। এ সবই ঠিক আছে। একই সঙ্গে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী গঠন করতে হবে। কিন্তু এই অগ্রবর্তী বাহিনীর লক্ষ্য শুধু কোনো আঞ্চলিক তাগুতকে উৎখাত করা নয়, নিছক ভূমি দখল করা নয়, ইসরাইলের বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলা চালানো নয়; বরং এই অগ্রবর্তী দলের উদ্দেশ্য হবে বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামোকে উলটেপালটে দেওয়া, কুফরের সিংহাসন ভেঙে ফেলা এবং শক্তির যে ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান, তা কমিয়ে আনা। জিহাদকে কোনো একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা। কুফরের কেন্দ্র, কুফরের পরাশক্তি এ যুগের হোবল অ্যামেরিকাকে আঘাত করা।

Scanned by CamScanner

৪. শায়খ উসামার 'সাপের মাথায় আঘাত করা'র নীতি

শায়খ উসামা রাহ. বলেন, কুফরিশক্তি একটি বিষধর সাপের মতো, যার মাথা অ্যামেরিকা। এই অ্যামেরিকার সাহায্যেই মুসলিমবিশ্বের তাগুতগুলো টিকে আছে। এই অ্যামেরিকার শক্তিতেই গুটিকয়েক ইয়াহুদি ইসরাইলে রাজত্ব করছে। সাপের মাথা ভেঙে দিলে যেমন সাপ তাড়াতাড়ি মরে যায়, বাকি শরীর দিয়ে কিছু করতে পারে না; অ্যামেরিকাকে শেষ করতে পারলে তেমনি বাকি সব কুফরিশক্তি এবং স্থানীয় মুরতাদরাও দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্যথায় আমরা যদি স্থানীয় মুরতাদদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তাহলে এক মুরতাদকে সরালে অ্যামেরিকা আরেকটাকে ক্ষমতায় বসাবে। যেমন, মিসরের মুজাহিদরা যখন আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে, তখন তার জায়গায় অ্যামেরিকা আরেক তাগুত হোসনি মোবারককে বসিয়ে দেয়। এতে শরিয়ত প্রতিষ্ঠাও হবে না, খিলাফাহও কায়েম হবে না; বরং আমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে। তাই 'সাপের মাথা অ্যামেরিকা'র উপর আঘাত হানাই উপযুক্ত কাজ হবে। পারস্যের বিরুদ্ধে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এই নীতিই প্রয়োগ করেছিলেন।

যখন এরকম বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা চলছিল, তখন পাকিস্তানে জুমআর নামাজে গমনকালে গাড়িতে লুক্কায়িত বোমার বিস্ফোরণে শায়খ আবদুল্লাহ আজজাম রাহ. তাঁর দুই ছেলেসহ শাহাদাত বরণ করেন। তারপর শায়খ উসামা আরব মুজাহিদদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আল কায়দার আমির নিযুক্ত হন। শায়খ উসামার 'সাপের মাথায় আঘাত করা'র পরিকল্পনাই আল কায়দার মানহাজ হিশেবে গৃহীত হয়। এর আলোকে কাজ শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি তারা আঞ্চলিক জিহাদি আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করতে থাকেন এবং নিজেদের নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

৫. অ্যামেরিকাকে ময়দানে টেনে আনা

শায়খ উসামা চাচ্ছিলেন অ্যামেরিকা কোনো একটি মুসলিম ভূমিতে যুদ্ধের জন্য নেমে আসুক, যাতে তাকে সেখানে আটকে রেখে একটা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে লিপ্ত করে ধীরে ধীরে তার শক্তিতে ক্ষয় ধরানো যায়। এ লক্ষ্যে আল কায়দা বিভিন্ন স্থানে অ্যামেরিকার উপর আঘাত হানতে থাকে। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে অ্যামেরিকান সেনাদের লক্ষ করে ইয়ামেনে হোটেলে বোমা হামলা হয়। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মোগাদিসুতে দুটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করা হয়। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নাইরোবি ও দারুস সালামে অ্যামেরিকান দূতাবাসে জোড়া বোমা হামলা হয়। এতদ্সত্ত্বেও অ্যামেরিকা কোনো মুসলিম দেশে আক্রমণ করতে চাচ্ছিল না। অবশেষে ৯/১১-এর চূড়ান্ত হামলাটা

Scanned by CamScanner

চালানো হয় একেবারে অ্যামেরিকার কলিজার মধ্যে। তখনই সে আফগানে হামলা করে ধ্বংসের ফাঁদে পা দেয়।

৬. ৯/১১ হামলার পেছনে শায়খ উসামার তিনটি মূল লক্ষ্য

৯/১১ হামলার পেছনে শায়খ উসামার তিনটি মূল লক্ষ্য ছিল :

১. অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে টেনে আনা এবং সেখানে তাদের আটকে ফেলা। পাশাপাশি অ্যামেরিকাকে অন্য আরও ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে তাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করা।

২. অ্যামেরিকার অর্থনীতিতে ধ্বস নামানো।

৩. অ্যামেরিকার জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট করে দেওয়া।

আলহামদুলিল্লাহ এ তিনটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। আফগানিস্তানে দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ যুদ্ধের ফলে তার সামরিক বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর সে কোনো মুসলিম ভূমিতে নতুন করে সৈন্য পাঠাতে সাহস করে না। এ কারণেই পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে কতকিছু হয়ে যাওয়ার পরও সে সৈন্য পাঠাচ্ছে না। আর এ দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে গিয়ে তার অর্থনীতিতে ধ্বস নেমেছে। উপরন্তু অ্যামেরিকার এইসব ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তের কারণে অ্যামেরিকান জনগণও তাদের নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। এখন তাকে যুদ্ধে জয়লাভের পরিকল্পনার পরিবর্তে জাতির সন্তুষ্টি রক্ষার দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে।

৭. গেরিলাযুদ্ধের কৌশল

গেরিলাযুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযোগী হলো পাহাড় ও বনাঞ্চল, যেগুলো তাগুতদের আওতামুক্ত। কারণ, সেগুলো মুজাহিদদেরকে বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেবে। মুজাহিদরা সেখান থেকে হামলা করে আবার নিরাপদে সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। পক্ষান্তরে গেরিলাযুদ্ধের জন্য সবচেয়ে অনুপযোগী হচ্ছে শহরাঞ্চল। তবে এখানেও গেরিলাযুদ্ধ দাঁড় করানো সম্ভব, যদি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করা যায়। এ ক্ষেত্রে জনগণ পানি; আর গেরিলারা মাছতুল্য। গেরিলারা সাধারণ জনগণের মধ্যেই অবস্থান করবে। তাদের মাঝেই প্রশিক্ষণ নেবে। তাদের থেকে এসে হামলা করে আবার তাদের কাছেই আশ্রয় নেবে। যদি ব্যাপক জনসমর্থন না থাকে তাহলে গেরিলাদের অবস্থা ডাঙায় তোলা মাছের মতো হবে। কদিনের মধ্যেই জিহাদ ভেঙে যেতে বাধ্য।

Scanned by CamScanner

পক্ষান্তরে ব্যাপক জনসমর্থন থাকলে শহরাঞ্চলেও গেরিলাযুদ্ধ সফল হবে, যেমনটা শামে ঘটছে। নুসাইরিদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের ব্যাপক জনসমর্থন থাকায় মুজাহিদরা সেখানে এক অসম শক্তির বিরুদ্ধেও অটল-অবিচল আছেন।

৮. ইমারাহ ঘোষণা

যথাযথ সামর্থ্য না থাকলে ইমারাহ ঘোষণা করা আল কায়দার মানহাজে নেই, এমনকি বিশাল অংশের ওপর দখল থাকলেও না। কারণ :

- মুজাহিদরা মূলত কোথাও স্থিতিশীলতায় নেই। আজ যে অংশের দখল আছে, হতে পারে কাল তা ছেড়ে দিতে হবে; যেমনটা অনেকবার ঘটেছেও।
- অফিসিয়ালভাবে ইমারাহ ঘোষণা করলে কাফিররা এর ওপর আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। তখন তা রক্ষা করা কঠিন হবে।
- ইমারাহ ঘোষণা না দিয়ে কাজ করলে মুজাহিদদের ওপর আক্রমণকে জনগণ নিজেদের ওপর আক্রমণ বলে বসবে। পক্ষান্তরে ইমারাহ ঘোষণা দিয়ে দিলে তখন জনগণ আল কায়দাকে নিজেদের থেকে আলাদা করে দেখবে। তাদের সমর্থন কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এসব কারণে যথেষ্ট এলাকা দখলে থাকা সত্ত্বেও সোমালিয়া, ইয়ামেন এবং অন্যান্য অঞ্চলে আল কায়দা ইমারাহর ঘোষণা দেয়নি। ইরাকে যে 'আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ' ঘোষিত হয়, তা মূলত শায়খ উসামা ও অন্য আমিরদের পরামর্শে হয়নি; বরং তারা নিজেরা পরামর্শ ব্যতিরেকেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে।
- অধিকন্তু ইমারাহ ঘোষণা দেওয়া ছাড়াই যেহেতু শরিয়া কায়েম করা যাচ্ছে, তখন বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমারাহ ঘোষণা না দেওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই।

৯. গোপনে প্রসার ঘটানো

এ ছাড়া আল কায়দার আরেকটি কৌশল হলো গোপনে নিজেদের প্রসার ঘটানো। নিজেদের সর্বপ্রকার কার্যক্রম ও বিভিন্ন দলের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি গোপন করা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মিডিয়াতে প্রচারে না যাওয়া। অন্যদিকে জামাআতুল বাগদাদির আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল কায়দা চায় সবাইকে বোঝাতে যে, তারা কোথাও নেই। জামাআতুল বাগদাদি চায় সবাইকে বোঝাতে যে,

Scanned by CamScanner

তারা সব জায়গায় আছে। বিভিন্ন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা গোপন করার ব্যাপারে শায়খ উসামার যুক্তি ছিল, আল কায়দার সঙ্গে যখন কোনো দলের সম্পৃক্ততা প্রকাশ পায়, তখনই তাদের বিরুদ্ধে কুফফারের আক্রমণ বেড়ে যায়। এ কারণে এটা গোপন রাখাই উত্তম। তাই শামে আল কায়দার শাখা জাবহাতুন নুসরা আল কায়দার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততা গোপন রেখে কাজ করছিল; কিন্তু অবশেষে জামাআতুল বাগদাদির কারণে তা প্রকাশ পেয়ে যায়।

দুই. কৌশলগত পর্যালোচনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে জিহাদি আন্দোলনের ধারার সূচনা আফগান-ফেরত মুজাহিদদের মাধ্যমে। এ দেশে কাজ করেছে প্রধান দুটি জিহাদি সংগঠন : হারাকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ (হুজি-বি) এবং জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)। প্রথমটা কওমি ধাঁচের, দ্বিতীয়টা সালাফি ধাঁচের। হুজি-বি'র প্রতিষ্ঠা ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে আর জেএমবির প্রতিষ্ঠা ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।

হারাকাতুল জিহাদের একটি অংশ একপর্যায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় যোগ দেয়, যা তাদের ইরজা'র পরিচায়ক। অন্যদিকে জেএমবির একটি অংশের মধ্যে তাকফিরের ব্যাপারে চরমপন্থা বিদ্যমান। বিভিন্ন কারণে জেএমবির মাঝে ফাঁটল সৃষ্টি হয়। বাগদাদির খিলাফাহ ঘোষণার পর নব্য জেএমবির একটা অংশ তাদের হাতে বায়আতও দেয়। অবশ্য জেএমবির পুরানো সদস্যরা তাদেরকে বায়আত দেয়নি।

১. হুজি-বি ও জেএমবির ব্যর্থতা : কারণ ও শিক্ষা

প্রথমদিকে এ দুটি দল কিছুটা সফলতা দেখালেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন :

- দুটি তানজিমই সেই ভুল করেছে, যা শায়খ আবু বাসির রাহ.-এর উদ্ধৃতিতে উঠে এসেছে—'কারণ, জিহাদি জামাআতগুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।' হুজি-বি এবং জেএমবির ব্যাপারে এই কথা শতভাগ প্রযোজ্য। এ কারণেই রমনা বটমূলে হুজি-বি'র হামলা এবং আদালতে জেএমবির হামলা সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রায় কোনো সমর্থন পায়নি বললেই চলে; বরং সরকারের প্রোপাগান্ডায় তা হিতে বিপরীত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

- একই সঙ্গে দুটো তানজিম একই ভুল করেছে, যাকে সামরিক পরিভাষায় বলা হয় Strategic Overreach বা 'স্বীয় সক্ষমতার বাইরে প্রসার'। এর অর্থ হলো, সক্ষমতা তৈরি করার আগেই নিজের কর্মকাণ্ডের পরিধি এমনভাবে বাড়ানো, যা শেষপর্যন্ত নিজের পতন ডেকে আনে। বিশেষ করে জেএমবির ব্যাপারে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশের আগে জেএমবি তাদের আঞ্চলিক কাজে ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছিল এবং পরিস্থিতিও মোটামুটি অনুকূলে ছিল; কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তারা এমন এক সময়ে আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়, যখন তাদের কাজের বিপরীতে যে প্রতিক্রিয়া হবে, তার মোকাবিলা করার সক্ষমতা তাদের তৈরি হয়নি। যে কারণে সরকার বেশ দ্রুত তাদের শীর্ষ নেতাদের আটক করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের নেটওয়ার্ক উন্মোচনে সক্ষম হয়।
- চোখে পড়ার মতো নিজেদের কোনো মিডিয়া ছিল না। এমনকি জেএমবির নিজেদের কোনো মুখপাত্রও ছিল না। মিডিয়া একচেটিয়াভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে গেছে। তবে এটা সত্য, বর্তমানে ইন্টারনেটের যে প্রচলন আছে, যার কারণে অনলাইন-মিডিয়ার প্রসার আছে, তেমনটা তখন ছিল না। কিন্তু তবুও নিজেদের একটি মিডিয়া থাকার দরকার ছিল; বিশেষত জেএমবির, যেহেতু তারা জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।
- যথাযথ অস্ত্রের মজুদ না রাখা। জিহাদি সংগঠনগুলোর জন্য আবশ্যক বিস্ফোরকের সকল উপকরণ প্রয়োজন পরিমাণ মজুদ রাখা। উঁচুমানের বিস্ফোরক আনা-নেওয়ার রুট তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। সংগঠনে যদি শুধু একজন বোমা বিশেষজ্ঞ থাকে, তবে তার এই শিক্ষা কয়েকজন উপযুক্ত ছাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং একবার ছাত্রদের প্রশিক্ষণ শেষ হলে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে, এক জায়গায় রাখা যাবে না, যাতে সবাই একসঙ্গে ধরা না পড়ে। অন্যথায় পুরো জামাআতের বিস্ফোরক ব্যবহারের সক্ষমতা কমে যাবে।
- সিকিউরিটি তথা সাংগঠনিক কাজের গোপনীয়তার নিরাপত্তাগত দুর্বলতা। আমরা এই দুই তানজিমের ক্ষেত্রে এখনো দেখতে পাই, কোনো একটি কাজ করার পরপর এবং অনেক ক্ষেত্রে কাজের আগেই (অর্থাৎ, প্রস্তুতির সময়) তারা ধরে পড়ে যাচ্ছেন। এই দুই তানজিমের পারস্পরিক

Scanned by CamScanner

যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির কী করুণ অবস্থা তা বোঝার জন্য এটাই প্রমাণ হিশেবে যথেষ্ট। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ দুটি তানজিমের নেটওয়ার্ক এত গভীরভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে, কোনো একটি কাজের পর কাজের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের তো বটেই; অন্য আরও কিছু সদস্যকেও তার গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে।

২. পর্যালোচনা

হুজি-বি এবং জেএমবির ইতিহাস থেকে বেশ কিছু মৌলিক বিষয় উঠে আসে, যা আমাদের সকলের গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ :

১. যদি আমরা আসলেই বাংলাদেশে এমন একটি জিহাদ শুরু করতে চাই, যা বাংলাদেশের মানচিত্র পালটে দেবে এবং বাস্তবতা আগাগোড়া বদলে দেবে, তাহলে আমাদের একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, আসবাব ও রসদ মজুদ করতে হবে। হুটহাট কিছু করা যাবে না। একটি-দুটি প্রলয়ঙ্ককারী হামলা দিয়ে বিশ্বের মনোযোগ হয়তো পাওয়া যাবে; কিন্তু সম্পূর্ণ শরিয়া কায়েম, তাগুতের পতন এবং সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হবে না।

২. দীর্ঘমেয়াদী গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গেলে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের মধ্যে মুজাহিদদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। শায়খুল মুজাহিদ আবদুল্লাহ আজজাম রাহ. যাকে বলেছেন 'দাওয়াত'; আর মাও সেতুং যাকে বলেছে 'জনগণের জাগরণের পর্যায়'। জনগণ ছাড়া গেরিলাযোদ্ধা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। মনে রাখতে হবে, আমাদের শত্রুর বিমান, ট্যাংক, যুদ্ধজাহাজ আছে। ক্রুসেডার আর হিন্দুত্ববাদী ভারতের সমর্থন তার আছে। আছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন আর একটি রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। জনগণের সমর্থন ছাড়া আপনি যদি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হবে।

৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ও গাঁথুনিকে বুঝতে হবে। শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি তাঁর *দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল আলামিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ* (The Global Islamic Resistance Call) গ্রন্থে কোনো ভূমির Open Front জিহাদের জন্য উপযুক্ততা পরিমাপের

Scanned by CamScanner

জন্য কিছু ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন, যার মধ্যে একটি হলো ভৌগোলিক অবস্থা। যেহেতু মুজাহিদদের জামাআত এবং শত্রুদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নেই, তাই তাদের যুদ্ধ হবে একটি ভারসাম্যহীন যুদ্ধ বা Asymmetric Warfare। এ ধরনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকে **শক্তিশালী শত্রুকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে টেনে এনে শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে তার পরাজয় ঘটানো।** যেমন, অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনে পরাজিত করা হয়েছে।

শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি তাঁর গ্রন্থে ব্যাপক বিশ্লেষণের পর দেখিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদী গেরিলাযুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ভূমি হলো যেখানে পর্বত ও জঙ্গল আছে। কারণ, পাহাড় ও জঙ্গল গেরিলাদের আশ্রয়স্থল হিশেবে উত্তম। এগুলো বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেয়। এ ছাড়া মরুভূমির উপস্থিতি এবং দুর্গম ভূখণ্ড গেরিলাযুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমতল। যে কারণে যে নীতি আফগানিস্তানে প্রযোজ্য, তা বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয়। সোমালিয়া, ইয়ামেন, ইসলামি মাগরিব, লিবিয়া, কাশমির, ওয়াজিরিস্তান ইত্যাদি সবগুলো জায়গাতেই পাহাড় বা জঙ্গল; কিংবা মরুভূমি আছে এবং এসব জায়গা বেশ দুর্গম। যে কারণে এসব ভূখণ্ডের মুজাহিদরা গেরিলাযুদ্ধে সফল হয়েছেন।

তাহলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কী করা যেতে পারে? এ জন্য আমরা অন্য দুটি ভূখণ্ডের দিকে তাকাতে পারি, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলাযুদ্ধ সফল হয়েছে। এ দুটি ভূখণ্ড হলো ইরাক এবং শাম। হ্যাঁ, একথা সত্য যে, শাম বা ইরাক কোনোটাই বাংলাদেশের মতো সমতল নয়। শামে পাহাড় এবং মরুভূমি দুটোই আছে আর ইরাকেও মরুভূমি আছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, শাম এবং ইরাকে জিহাদ এসব দুর্গম অঞ্চলে শুরু হয়নি; বরং এ দু-ক্ষেত্রেই শহরকেন্দ্রিক গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের প্রসার ঘটেছে। বিশেষ করে শামে। আর এখানেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনের প্রশ্ন আসে। ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল অ্যামেরিকার আগ্রাসনের মাধ্যমে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের উপর অ্যামেরিকা সমর্থিত শিয়া শাসন চাপিয়ে দেওয়ার কারণে। একই সঙ্গে ইরাকি সমাজ গোত্রনির্ভর। যে কারণে গোত্রীয় নিয়মকানুনের প্রভাব ইরাকি সমাজে ছিল। একই সঙ্গে গোত্রগুলোর কাছে কিছু অস্ত্র মজুদ ছিল, যেগুলো সবসময় তাদের কাছে থাকে।

অন্যদিকে শামে বিপ্লব এবং জিহাদ শুরু হয় শহরগুলোতে। দামেশক, দারা, আলেপ্পো, ইদলিব, হিমস, হামা—এসব শহর ছিল বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। শামের মানুষ পাঁচ বছরের ভয়াবহ যুদ্ধের পরও প্রচণ্ড অনাহার, ব্যাপক মৃত্যু এবং অবর্ণনীয় কষ্টের

Scanned by CamScanner

পরও জিহাদ আঁকড়ে আছে। এর কারণ কী? কারণ হলো সামাজিক বাস্তবতা। শামে সংখ্যালঘু নুসাইরি সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের শাসন করত। যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়, তখন সরকার ব্যাপকভাবে সুন্নিদের হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন শুরু করে। যে কারণে সুন্নিরা বাধ্য হয় হাতে অস্ত্র তুলে নিতে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশে ইরাকের মতো শিয়া-সুন্নি বিভেদ নেই। এখানে শিয়ারা সংখ্যায় অল্প এবং তারা ক্ষমতায়ও নেই। বাংলাদেশের চাইতে পাকিস্তানে শিয়াদের প্রকোপ অনেক বেশি। সেখানে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধু শিয়াবিরোধী কৌশল দিয়ে সেখানে তেমন এগোনো যায়নি। সেখানে যদি শুধু শিয়া বিরোধিতার কৌশল জিহাদের জন্য কার্যকর না হয়, তবে বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে শিয়া-সুন্নি বিভেদ নেই—এটা কতটুকু কার্যকর হতে পারে?

যারা মনে করে বাংলাদেশে শিয়াবিরোধী কিংবা আহমাদিয়াবিরোধী হামলা দিয়ে জনগণকে জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে, তারা নির্বোধ। একইভাবে রমনা বটমূল, নিউ ইয়ার কিংবা ভ্যালেন্টাইন ডের কোনো অনুষ্ঠানে চাঞ্চল্যকর হামলা করা তুলনামূলক সহজ; কিন্তু কৌশলগতভাবে এগুলোর তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। কারণ, সাধারণ জনগণকে এ ধরনের হামলাগুলো দূরে সরিয়ে দেবে। এ কারণে পরিস্থিতি সৃষ্টির আগে এমন কোনো হামলা করা যাবে না, যা মুজাহিদিন ও জিহাদকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে; বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যা মেলে, তা হলো শামের পরিস্থিতি।

যদিও শামের মতো নুসাইরিরা বাংলাদেশে নেই; কিন্তু বাংলাদেশে একটি জনসমর্থনহীন সরকার আছে, যারা সরাসরি ভারত দ্বারা সমর্থিত এবং যে সরকারের অধীনে সচিবালয়ে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যাপকভাবে মুশরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইসকনের মতো উগ্র সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্যরাও তো এখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হচ্ছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রশাসনে মুশরিকদের এই ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণা ও অসন্তোষ রয়েছে। একই সঙ্গে সরকারের পরিষ্কার ইসলামবিরোধী একটা ইমেজ আছে, যা জনগণের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু কীভাবে ইসলামের দিকে আসতে হবে, কীভাবে ইসলাম আনতে হবে এ নিয়ে মানুষ এখনো ওয়াকিবহাল নয়। একই সঙ্গে আছে কওমি ভাইদের উপর হাসিনার ক্রমাগত অত্যাচারের এক ধারা, যা শুরু হয়েছিল ৫ মে এবং যার সিলসিলা আমরা দেখতে পেয়েছি বি-বাড়িয়াতে। পাশাপাশি বাড্ডাতে মন্দিরে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মতো

Scanned by CamScanner

ঘটনা এবং সেই মালাউনকে পুলিশের নিরাপত্তা দেওয়া এই সরকারের ইসলামবিরোধী চরিত্রকে আরও পরিষ্কার করে তোলে। এ ধরনের ঘটনাকে যদি সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়, তাহলে বিরাট ফল পাওয়া যাবে। তবে আমরা এ ঘটনাটির ক্ষেত্রে তা করতে ব্যর্থ হয়েছি।

মোটকথা, বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী গেরিলাযুদ্ধের একমাত্র উপযোগী মডেল হলো শহরকেন্দ্রিক যুদ্ধ, যেমনটা আমরা শামে দেখেছি। আর এরকম একটি দীর্ঘমেয়াদী গেরিলাযুদ্ধ সফলভাবে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন জনসমর্থন এবং জনসম্পৃক্ততা। তবে জনসমর্থন তথা জনসম্পৃক্ততা তৈরির জন্য শিয়া, আহমদিয়া, মিশনারি বা এনজিওদের টার্গেট করা বাংলাদেশের জন্য কার্যকারী হবে না; যদিও এরা সবাই কাফির এবং ইসলামের শত্রু। জনসমর্থনহীন একটি শাসক যদি সরাসরি মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, সে ক্ষেত্রে যদি শাসক এবং শাসকের সমর্থক গোষ্ঠীকে মুসলিমদের বিপরীতে দেখানো যায়, (অর্থাৎ, আওয়ামীলীগ বনাম মুসলিম, আওয়ামীলীগ-সেকুলার বনাম মুসলিম, আওয়ামী-হিন্দু-সেকুলার বনাম মুসলিম) তাহলে তখন শহরভিত্তিক গেরিলাযুদ্ধ এমন ভূখণ্ডেও সফল হতে পারে, যা ভৌগলিকভাবে গেরিলাযুদ্ধের জন্য অতটা উপযুক্ত নয়।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, এ যুদ্ধটা কাফির, তাগুত, ভারত, আওয়ামীলীগ বনাম ইসলাম এভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। হাসিনা-ভারত-সেকুলার বনাম জিহাদি বা সালাফি বা দেওবন্দি এভাবে চিত্রায়িত করলে হবে না। এর উত্তম প্রমাণ হলো শাহবাগ বনাম জামাআত যখন ছিল। অর্থাৎ, মিডিয়া যখন এভাবে চিত্রায়িত করেছিল, তখন শাহবাগ জিতেছিল; কিন্তু যখন ব্যাপারটা শাহবাগ বনাম ইসলামে রূপ নিল, তখন মিডিয়ার হাজার প্রোপাগান্ডা কোনো কাজে আসল না। অথচ এর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ, যখন ব্যাপারটা একটি দলকেন্দ্রিক ছিল, ততক্ষণ কিন্তু শাহবাগিরাই জিতেছিল। তাই জিহাদিদের কাজ হবে জিহাদের পরিস্থিতি শুরুর আগ পর্যন্ত সংঘাতটাকে আওয়ামী-নাস্তিক-সেকুলার-ভারত-ক্রুসেডার জোট বনাম ইসলাম হিশেবে চিত্রায়িত করা এবং আল্লাহর ইচ্ছায় একবার জিহাদ শুরু হয়ে গেলে তখন তা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়া। আর এটা স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

Scanned by CamScanner

শাসক ছাড়া কীভাবে জিহাদ করব

কিছু মানুষ একথা বলে বেড়ায় যে, শাসক ছাড়া কোনো জিহাদ নেই। শাসকের অনুপস্থিতিতে যেসব লড়াই সংঘটিত হয়, তা সবই ফিতনার লড়াই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সালাফে সালিহিন ও উম্মাহর ইমামগণের ইজমা অনুযায়ী এ মতের কোনো ভিত্তি নেই। এটি একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত মত, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিস এবং শরয়ি নীতি ও ফিকহি মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন :

১. কুরআনের যে সমস্ত আয়াত ও রাসুল ﷺ-এর যে সকল হাদিসে আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলোতে এ ধরনের কোনো শর্তারোপ করা হয়নি; বরং এ আয়াত ও হাদিসগুলো ব্যাপক ও শর্তমুক্ত। আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহে একযোগে সমস্ত মুমিন-মুসলমানকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾

তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। [সুরা বাকারা : ১৯০]

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

(জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়ো হালকা অবস্থায় থাকো বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে যাও। [সুরা তাওবা : ৪১]

রাসুল ﷺ বলেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

Scanned by CamScanner

তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে জিহাদ করো তোমাদের সম্পদ, জীবন এবং জিহ্বার দ্বারা।[১৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا﴾

সুতরাং তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। তোমার ওপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারও দায়ভার নেই। অবশ্য মুমিনদের উৎসাহ দিতে থাকো। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ কাফিরদের যুদ্ধ-ক্ষমতা চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড এবং তার শাস্তি অতি কঠোর। [সূরা নিসা : ৮৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু হাজম রাহ. বলেন,

وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد

'এটা প্রতিটি মুসলমানের প্রতি আল্লাহ তাআলার সম্বোধন। সুতরাং প্রত্যেকেই জিহাদের ব্যাপারে আদিষ্ট, যদিও-বা তার সঙ্গে আর কেউ না থাকে।'[২০]

ইমাম ইবনু কুদামা রাহ. বলেন,

الجهاد فرض على الكفاية.... الخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان، ثم يختلفان أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره

'জিহাদ সাধারণ অবস্থায় ফরজে কেফায়া। ...আয়াতের শুরুতে এমনভাবে সম্বোধন করেছে, যা সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে—যেমনটা ফরজে আইনের ক্ষেত্রে করা হয়। সম্বোধন একই রকমের হলেও বিধানের বিবেচনায় দুটোতে ভিন্নতা চলে আসে। আর তা হলো, ফরজে কেফায়া আমল কতক মানুষের সম্পাদন করার দ্বারা আদায় হয়ে যায়। আর ফরজে আইন আমল একজন সম্পাদন করার দ্বারা অন্যজন থেকে রহিত হয় না।'[২১]

শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান রাহ. বলেন,

---

১৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫০৪।

২০ *আল-মুহাল্লা* : ৭/৩৫১।

২১ *আল-মুগনি* : ১০/৩৬৪।

Scanned by CamScanner

ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون، فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه، لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف

'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জিহাদের ফরজিয়্যাত (আবশ্যকতা) কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে এবং সকল মুমিনকেই সে ব্যাপারে সম্বোধিত থাকবে। সুতরাং যদি কোথাও এমন কোনো সংঘবদ্ধ দল থাকে যাদের প্রতিরক্ষা-শক্তি রয়েছে, তাহলে তাদের জন্য নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে জিহাদ করা ওয়াজিব। এ ফরজিয়্যাত না তাদের থেকে কখনো রহিত হবে আর না অন্য দলসমূহ থেকে রহিত হবে।'[২২]

২. জিহাদ দুই প্রকার :

ক. প্রথম প্রকার হলো, আক্রমণাত্মক জিহাদ। অর্থাৎ, শত্রুভূমিতে গিয়ে শত্রু তালাশ করা। এ প্রকারের জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্যও ইমাম বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। হ্যাঁ, যখন ইমাম নিজ দায়িত্বে জিহাদ সম্পাদন করতে থাকবে, তখন তার অনুমতি ও সিদ্ধান্ত ব্যতীত জিহাদে নেমে পড়া বা স্বেচ্ছাচারিতা করা যাবে না। কারণ, এ বিষয়টির দায়িত্ব মূলত তাকে দেওয়া হয়েছে। তাই তার থেকে অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব হবে। তবে তা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করবে, সে গুনাহগার হবে ঠিকই; কিন্তু তার জিহাদ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি ইমাম না-ই থাকে বা হারিয়ে গিয়ে থাকে; কিংবা নিহত হয়ে যায় তাহলে জিহাদ বন্ধ করে থাকবে না।

ইমাম ইবনু কুদামা রাহ. বলেন,

فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع

'যদি খলিফা বিদ্যমান না থাকে তাহলে জিহাদ বিলম্বিত করা হবে না। কারণ, বিলম্ব করার দ্বারা জিহাদের কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে যদি কোনো গনিমত অর্জিত হয়, তাহলে তা শরিয়তের বিধান অনুসারে গনিমতের হকদাররা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে।'[২৩]

---

২২ *আদ-দুরারুস সুন্নিয়্যাহ* : ৭/৯৮।
২৩ *আল-মুগনি* : ১০/৩৭৫।

Scanned by CamScanner

সুতরাং যদি ইমাম বিদ্যমান থাকা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তই হতো, তাহলে ইমামের অনুপস্থিতিতে জিহাদ স্থগিত রাখা এবং ইমাম পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা ওয়াজিব হতো। তখন কোনোভাবেই মুসলমানদের কল্যাণের স্বার্থে তা চালিয়ে নেওয়ার অবকাশ থাকত না এবং গনিমত ভক্ষণও বৈধ হতো না।

এ ছাড়াও ইমামের বিদ্যমান থাকা যদি আবশ্যকই হতো, তাহলে যে ক্ষেত্রে মুজাহিদদের জন্য তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা সম্ভাবিত না হবে, যুক্তির দাবি অনুযায়ী সে ক্ষেত্রেও জিহাদ বিলম্বিত করা ওয়াজিব হতো। অথচ প্রয়োজনের তাগিদে ইমাম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার অনুমতি ছাড়াই মুজাহিদদের জন্য জিহাদ পরিচালনা করা বৈধ। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাসুল ﷺ-এর জীবনীতেই পাওয়া যায়। সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন,

'...তারপর যখন আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধিতে আবদ্ধ হলাম এবং আমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলাম, তখন আমি একটি গাছতলায় গিয়ে তাঁর নিচের কাঁটা প্রভৃতি পরিষ্কার করে তাঁর গোঁড়ায় একটু শুয়ে পড়ি। এমনসময় মক্কাবাসী চারজন মুশরিক এসে রাসুল ﷺ সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথা বলতে লাগল।

আমার কাছে ওদের কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ লাগল এবং আমি স্থান পরিবর্তন করে অন্য একটি গাছের তলায় চলে গেলাম। তারা তাদের অস্ত্র গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। এমন সময় প্রান্তরের নিম্নাঞ্চল থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল,

يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ

হে মুহাজিরগণ, সাহায্য! ইবনু জুনায়ম নিহত হয়েছে।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার তরবারি উঠিয়ে ধরলাম এবং ওই চারজনের উপর আক্রমণ চালালাম। তখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাদের অস্ত্রগুলো হস্তগত করলাম এবং তা আটি বেঁধে আমার হাতে নিলাম। এরপর আমি বললাম, 'যে মহান সত্তা মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাথা তোলে, তবে তাঁর সেই অঙ্গে আঘাত (করে বিচ্ছিন্ন) করব যেখানে তাঁর চোখ দুটো রয়েছে (অর্থাৎ, ঘাড়ে)।'

তারপর তাদেরকে আমি হাঁকিয়ে রাসুল ﷺ-এর নিকট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। এমন সময় আমার চাচা আমির "আবালাত" গোত্রের একজনকে রাসুল ﷺ-এর নিকট নিয়ে এসেছেন। তাকে বলা হতো মিকরাজ। সে ছিল আঘাত নিরোধক বস্ত্রাকৃত একটি ঘোড়ায় আসীন। আর তাঁর সঙ্গে ছিল ৭০ জন মুশরিক। রাসুল ﷺ তাদের দিকে

Scanned by CamScanner

তাকালেন এবং বললেন, "ওদেরকে ছেড়ে দাও, যাতে অপকর্মের সূচনা ওদের পক্ষ থেকেই হয় এবং পুনরাবৃত্তিও ওরাই করে"। একথা বলে রাসুল ﷺ তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করলেন—

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾

সেই পবিত্র সত্তা, যিনি মক্কা-প্রান্তরে তাদের হাতকে তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের উপর থেকে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। [সুরা ফাতহ : ২৪]

তারপর আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পথে এমন একটি মনজিলে আমরা অবতরণ করলাম, যেখানে আমাদের ও লিহয়ান গোত্রের মধ্যে কেবল একটি পাহাড়ের ব্যবধান ছিল। আর তারা ছিল মুশরিক। তখন রাসুল ﷺ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকটে দুআ করলেন—"যে ব্যক্তি রাতে নবি ও তাঁর সাহাবিদের পক্ষ থেকে খবরদারির জন্য পাহাড়ের উপর আরোহণ করবে।"'

সালামা বলেন, সে রাতে আমি দুই কি তিনবার ওই পাহাড়ে আরোহণ করেছিলাম। তারপর আমরা মদিনায় এলাম। রাসুল ﷺ তাঁর গোলাম রাবাহকে দিয়ে তাঁর উটগুলো পাঠালেন। আর আমিও তালহা রা.-এর ঘোড়ায় চলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘাস-পানি খাওয়ানোর জন্য উটগুলো চারণভূমির দিকে নিয়ে গেলাম। যখন আমাদের ভোর হলো, আবদুর রহমান ফাজারি চড়াও হয়ে রাসুল ﷺ-এর (বিচরণকৃত) সমস্ত উট ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং তাঁর রাখালকে হত্যা করল। আমি তখন রাবাহকে বললাম, "হে রাবাহ, নাও, এই ঘোড়া নিয়ে তুমি তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহকে পৌঁছে দিয়ো; আর রাসুল ﷺ-কে সংবাদ দাও যে, মুশরিকেরা তাঁর চারণভূমির উটগুলো লুটে নিয়ে গেছে।"

তিনি বলেন, তখন আমি একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম। তারপর মদিনার দিকে মুখ করে তিনবার হাক দিলাম, "ইয়া সাবাহা! (ভোরের আক্রমণ)।"

তারপর আমি লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করলাম এবং তাদের উপর তির নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর আমি মুখে এই চরণ উচ্চারণ করছিলাম—

وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

আমি আকওয়ার পুত্র। আজ সেই দিন, আজ ইতরকে (শায়েস্তা করার) দিন। আজকে কেমন মায়ের দুধ (খেয়েছ তা স্মরণের দিন)।

Scanned by CamScanner

তখন আমি তাদের যে কাউকে পেয়েছি, তাঁর ওপর এরকমভাবে তির নিক্ষেপ করেছি যে, তিরের অগ্রভাগ তার কাঁধের কোমল হাড় ছেদ করে বেরিয়েছে। আমি বলতে লাগলাম, "এ আঘাত নাও, আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরকে (শায়েস্তা করার) দিন। আজকে কেমন মায়ের দুধ (খেয়েছ তা স্মরণের দিন)।" আল্লাহর কসম, আমি তির নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ঘায়েল করতে লাগলাম এবং যখনই কোনো ঘোড়সওয়ার আমার দিকে ফিরত, তখনই আমি গাছের আড়ালে এসে তার গোঁড়ায় বসে তার প্রতি তির নিক্ষেপ করতাম আর তাকে জখম করে ফেলতাম।

অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে আসে এবং তারা সে সংকীর্ণ পথে ঢুকে, আমি তখন পাহাড়ের উপর উঠে সেখান থেকে (অবিরাম) তাদের উপর পাথর গড়িয়ে দিতে থাকলাম। এভাবে আমি তাদের পশ্চাদ্ধবন করতে থাকলাম যে পর্যন্ত-না আল্লাহর সৃষ্ট উটগুলোর প্রতিটি উট যা রাসুল ﷺ-এর ভারবাহীরূপে ছিল তা আমার পেছনে রেখে না যায়। তারা এগুলো আমার আওতায় ফেলে চলে গেল। তারপরও আমি তাদের অনুসরণ করে তাদের দিকে তির নিক্ষেপ করতে থাকলাম। এমনকি তারা ৩০টির বেশি চাঁদর এবং ৩০টি বল্লম নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্য ফেলে গেল। তারা যেসব বস্তু ফেলে যাচ্ছিল আমি তাঁর প্রত্যেকটিকে পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে যাচ্ছিলাম, যাতে রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ তা চিনতে পারেন।

অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে পৌঁছাল। এমন সময় বদর ফাজারির অমুক পুত্র এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো। এবার তারা সকলে মিলে সকালের খাবার খেতে বসল। আমি পাহাড়ের একটি শৃঙ্গে বসে পড়লাম। তখন সে ফাজারি বলল, "ওই যে লোকটাকে দেখছি সে কে?" তারা বলল, "লোকটির হাতে আমরা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছি। আল্লাহর কসম, সেই রাতের আধার থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত লোকটা আমাদের পেছন থেকে সরছে না। সে আমাদের প্রতি (অবিরাম) তির নিক্ষেপ করেছে, এমনকি আমাদের যথাসর্বস্ব সে কেড়ে নিয়েছে।" তখন সে বলল, "তোমাদের মধ্যকার চারজন উঠে গিয়ে তাঁর উপর চড়াও হও।" তখন তাদের চার ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর তারা যখন আমার কথা শোনার মতো নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছল।

তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, "তোমরা কি আমাকে চেনো?" তারা বলল, "না।" তিনি বলেন, আমি বললাম, "আমি সালামা ইবনু আকওয়া। কসম সেই পবিত্র সত্তার, যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন। আমি তোমাদের যাকেই পেতে চাইব (লক্ষ্য বানাব) তাকে ধরে ফেলব; কিন্তু তোমাদের কেউ চাইলেই আমাকে

Scanned by CamScanner

ধরতে পারবে না।” তখন তাদের একজন বলল, “আমিও তা-ই মনে করি।”

তিনি বলেন, তারপর তারা ফিরে গেল; আর আমি সেই স্থানেই বসে রইলাম। অবশেষে আমি গাছ-গাছালির মাঝ দিয়ে রাসুল ﷺ-এর অশ্বারোহীদের অগ্রসর হতে দেখলাম। তিনি বলেন, তাঁদের মধ্যে সবার আগে ছিলেন আখারাম আসাদি। তাঁর পেছনে আবু কাতাদা আনসারি। তাঁর পেছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দি। তিনি বলেন, আমি তখন আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরলাম। তিনি বলেন, তখন তারা (শত্রুরা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল। আমি বললাম, “হে আখরাম, ওদের থেকে সতর্ক থাকবে। তারা যেন রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ এসে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে।” আখারাম বললেন, “হে সালামা, তুমি যদি আল্লাহ ও কিয়ামত দিনের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য মনে করো, তবে আমার এবং শাহাদাতের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করো না।” সালামা বলেন, তখন আমি তাঁর পথ ছেড়ে দিলাম।

তখন তিনি আবদুর রহমানের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। আখরাম আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করলেন; আর আব্দুর রহমান বর্শার আঘাতে তাকে কতল করে দিলো এবং আখরামের ঘোড়ার উপর চড়ে বসল। ইতিমধ্যে রাসুল ﷺ-এর ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা রা. এসে পৌঁছলেন। তিনি আবদুর রহমানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন, আমি তখন এতই দ্রুতগতিতে তাদের পিছু ধাওয়া করে যাচ্ছিলাম যে, আর পেছনে (অনেক দূর পর্যন্ত) মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোনো সাহাবিকেই দেখতে পেলাম না। এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের ধুলিও আমার দৃষ্টিগোচর হলো না। এভাবে চলতে চলতে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তারা এমন একটি গিরিপথে উপনীত হলো, যেখানে জু-কারাদ নামক একটি প্রস্রবণ রয়েছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা পানি পান করতে অবতরণ করল। তখন তারা আমাকে তাদের পিছু ধাওয়া করে দৌড়ে আসতে দেখতে পেল। এক জায়গায় পানি পান করার পূর্বেই আমি সেখান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিলাম। তখন তারা পাহাড়ের একটি ঢালু উপত্যকার দিকে দৌড়াতে লাগল; আর আমিও তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম।

আমি তাদের যেকোনো একজনের নিকটবর্তী হলে তার কাঁধের অস্থিতে তির নিক্ষেপ করে বললাম, “আমি আকওয়ার পুত্র, ইতরদের (বোঝাবার) দিন আজ (দুধপান স্মরণের দিন)।” সে তখন বলল, “তার মা (পুত্রহারা হয়ে) তার জন্য কাঁদুক! তুমি কি সে আকওয়া, যে আমাদের সেই ভোর থেকে অতিষ্ঠ করে রেখেছ?” আমি বললাম,

Scanned by CamScanner

"হ্যাঁ, তোমার জানের দুশমন, (আমি) সেই তোমার ভোরবেলার আকওয়াই।"

তিনি বলেন, অতঃপর তারা দুটি ক্লান্ত ঘোড়া উপত্যকায় ছেড়ে চলে গেল। তিনি বলেন, তখন আমি ওই দুটোকে হাকিয়ে রাসুল ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি বলেন, সেখানে একটি অল্প দুধভর্তি "সাতিহা" (চামড়ার তৈরি পাত্র) এবং একটি পানিভর্তি সাতিহা নিয়ে এসে আমির আমার সঙ্গে মিলিত হলেন। আমি তখন অজু করলাম এবং (দুধ) পান করলাম। তারপর এমন অবস্থায় রাসুল ﷺ-এর কাছে এলাম, যখন তিনি ওই পানির কাছে ছিলেন, যা থেকে আমি ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এদিকে রাসুল ﷺ ওই সমস্ত উট ও মুশরিকদের নিকট থেকে আমার ছিনিয়ে আনা সব কিছু বর্শা ও চাঁদর প্রভৃতি হস্তগত করেছেন। তখন বিলাল লোকদের কাছে থেকে আমার উদ্ধারকৃত একটি উট জবাই করেছেন এবং তাঁর কলিজা ও কুজ রাসুল ﷺ-এর জন্য ভুনছিলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে সুযোগ দিন, আমি আমাদের লোকদের থেকে ১০০ জনকে বাছাই করে নিয়ে সেই দুশমনদের পিছু ধাওয়া করি, যাতে তাদের সকলকে এমনিভাবে হত্যা করব যে, তাদের খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।" তিনি বলেন, তখন রাসুল ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, চুলার আগুনের আভায় তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশ পেল। এরপর রাসুল ﷺ বললেন, "হে সালামা, তুমি কি মনে করো যে, তুমি তা-ই করবে?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন।" নবি ﷺ তখন বললেন, "এতক্ষণে তো তারা গাতফান পল্লিতে আতিথ্য ভোগ করছে।"

তিনি বলেন, পরে গাতফান গোত্রের একটি লোক এলো। সে বলল, "অমুক তাদের জন্য একটি উট জবেহ করেছে।" তারা যখন তার চামড়া ছড়াচ্ছিল তখন তারা ধুলোরাশি উড়তে দেখতে পায়। তখন তারা বলে উঠল, "ওরা (আকওয়া ও তার বাহিনী) তোমাদের নিকট এসে পড়েছে।" তখন তারা পালিয়ে যায়। এরপর আমাদের ভোর হল। রাসুল ﷺ বললেন,

كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ

"আমাদের আজকের সেরা অশ্বারোহী হচ্ছে আবু কাতাদা; আর আমাদের সেরা পদাতিক হচ্ছে সালামা।" তিনি বলেন, তারপর রাসুল ﷺ আমাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক হিশেবে গণিমতের দুই অংশ দিলেন। আমাকে তিনি একত্রে দুই অংশ দিলেন। তারপর রাসুল ﷺ আমাদের মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে আমাকে তাঁর সঙ্গে

Scanned by CamScanner

তাঁর উটনী “আদবার” পেছনে বসিয়ে নিলেন।’[২৪]

ইমাম ইবনু কুদামা রাহ. বলেন,

لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه حينئذ؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم

‘তারা খলিফার অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কেননা, যুদ্ধের বিষয়টি তার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে যদি শত্রুর আকস্মিক হামলার কারণে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা দুষ্কর হয়ে যায়, তাহলে তখন অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব থাকবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা ও তাদের উদ্দেশে জিহাদে বের হওয়ার মধ্যে কল্যাণ সুনির্ধারিত, যেমনিভাবে তাদের সঙ্গে জিহাদ পরিত্যাগ করলে ক্ষতিও নির্দিষ্ট।’[২৫]

সুতরাং যদি ইমাম বিদ্যমান থাকা ও তার অনুমতি গ্রহণ আক্রমণাত্মক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তই হতো তাহলে যখন ইমাম বিদ্যমান না থাকবে; কিংবা বিদ্যমান থাকলেও প্রয়োজনের খাতিরে তার অনুমতি ছাড়াই জিহাদ পরিচালিত হবে, তখন জিহাদ শুদ্ধ না-হওয়াই ছিল যুক্তির দাবি। কারণ, ‘শর্ত’ বলা হয় ওই বিষয়কে, যার অনস্তিত্বে যার জন্য তাকে শর্ত করা হয়েছে তার অনস্তিত্বও আবশ্যক হয়। অথচ এখানে এই দুই প্রকারের আক্রমণাত্মক জিহাদকে ফকিহগণ নাকচ করেননি। এ দ্বারা বোঝা গেল, ইমাম বিদ্যমান থাকা এ প্রকারের জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়; বরং উভয় অবস্থাতেই বিবেচ্য বিষয় হলো, মুসলমানদের কল্যাণ নিশ্চিত করা ও ক্ষতি বিদূরীত করা—যেমনটি ইমাম ইবনু কুদামা রাহ. জিহাদের কারণ চিহ্নিত করেছেন।

খ. দ্বিতীয় প্রকার হলো শত্রুদের থেকে মুসলিমভূমির প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। এ প্রকারে ইমামের উপস্থিতি শর্ত না হওয়ার বিষয়টি তো আরও অধিকতর স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কেননা, এ প্রকার জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনোই শর্ত নেই; বরং প্রত্যেকের ওপরই ওয়াজিব তার সাধ্যমতো প্রতিরোধ করা। সুতরাং সন্তান তার বাবার কাছে, স্ত্রী তার স্বামীর কাছে, ঋণগ্রহীতা তার ঋণদাতার কাছে অনুমতি চাইবে না। অথচ এরা সকলেই অনুমতি ও আনুগত্যে আমিরের তুলনায় বেশি হকদার ছিল। তা সত্ত্বেও এমতাবস্থায় তাদের হক বাতিল হয়ে গেছে। কেননা, জিহাদ এখন সকলের

২৪ *সহিহ মুসলিম* : ১৮০৭।
২৫ *আল-মুগনি* : ১০/৩৯০।

Scanned by CamScanner

ওপরই ফরজে আইন।

তাই এখন ইমামের বিদ্যমানতা শর্ত হওয়া তো দূরের কথা; বরং ইমাম বিদ্যমান থাকলেও তার থেকে অনুমতি গ্রহণ করা শর্ত নয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان

'আর ইজ্জত-আবরু ও দ্বীনের প্রতিরক্ষায় লড়াই করা সকলের ঐকমত্যে ওয়াজিব। কারণ, যেই আক্রমণকারী শত্রু মুসলমানদের দীন ও দুনিয়া উভয়টি ক্ষতিগ্রস্ত করে, ইমান আনার পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় কোনো ওয়াজিব নেই। তাই তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নেই; বরং সাধ্যমতো তাদের প্রতিহত করা হবে।'

তিনি আরও বলেন,

وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم

'শত্রুরা যখন মুসলিম শহরে অনুপ্রবেশ করে, তখন এতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তাদেরকে প্রতিহত করা প্রথমে তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী লোকদের ওপর, তারপর যারা তাদের বেশি নিকটবর্তী তাদের ওপর... এইভাবে সকল মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ, সকল ইসলামি শহর একটি শহরের মতো। আর তখন প্রতিরোধের লক্ষ্যে যুদ্ধযাত্রা করা পিতা ও ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীতই ওয়াজিব হয়ে যায়।'[২৬]

ইমাম ইবনু হাজম রাহ. বলেন,

إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم

'তবে যদি শত্রুরা মুসলমানদের কোনো জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করে বসে, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম এমন প্রত্যেকের ওপর ফরজ হয়ে যায় তাদের সাহায্যার্থে তাদের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করা।'[২৭]

- ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. বলেন,

معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة

২৬ *আল-ফাতাওয়াল মিসরিয়্যাহ* : ৪/৫০৮।

২৭ *আল-মুহাল্লা* : ৭/২৯২।

Scanned by CamScanner

فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة

'সকল মুসলিমের সুদৃঢ় বিশ্বাসে এই ইলম রয়েছে যে, যখন সীমান্তবাসীরা শত্রুর আশঙ্কা করে এবং তাদের কাছে প্রতিরোধক্ষমতা না থাকার ফলে তারা নিজেদের প্রাণ, সন্তান এবং শহর নিয়ে শঙ্কাবোধ করে তখন সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরজ হয়ে যায় শত্রু-অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করে মুসলমানদের থেকে তাদের জুলুমকে প্রতিহত করা। এবং এ ব্যাপারে উম্মাহর কারও মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।'[২৮]

এটাই হচ্ছে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার মর্মকথা। (অর্থাৎ, তাৎক্ষণিকভাবে বেরিয়ে পড়তে হবে)। সুতরাং যদি তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত থাকত—যেমন, খলিফা বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণ করা, তাহলে শত্রুরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সময় কখনোই তা ফরজে আইন হতো না। অথচ উম্মাহর কোনো আলিমই এ কথার প্রবক্তা নন।[২৯] এ কারণেই ইমাম মাওয়ারদি রাহ. বলেছেন,

فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين

'ফরজে কেফায়া জিহাদ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন ইমাম—যাবৎ-না তা ফরজে আইন হয়ে যায়। (অর্থাৎ, ফরজে আইন হয়ে গেলে তা আর ইমামের একক দায়িত্ব নয়; বরং প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব।)'

৩. ফিকহের কিতাবসমূহে জিহাদ অধ্যায়ে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, জিহাদ কার

---

২৮ আহকামুল কুরআন : ৪/৩১২।

২৯ আল্লামা ইবনু আবেদিন শামি রাহ. বলেন, 'যদি শত্রুরা মুসলিমদের কোনো সীমান্তে আক্রমণ চালায়, তাহলে তার নিকটবর্তী যুদ্ধে সক্ষম মুসলিমদের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে তাদের ওপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে তারা যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়; অথবা অপারগ না হলেও অলসতাবশত জিহাদ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের ওপর নামাজ ও রোজার মতো জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যা ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। এভাবে ক্রমানুসারে পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলিমের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।' *ফাতাওয়া শামি* : ৩/২৩৮।
আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন, 'এখানে উদ্দেশ্য হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট মুসলিম ভূখণ্ডে (কাফিরদের) আক্রমণ হওয়া। তাহলেই সে দেশের সকল মানুষের ওপর (জিহাদ) ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের ওপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলিমরাও যথেষ্ট না হয়; অথবা অলসতাবশত আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের ওপর এই হুকুম বর্তাবে। ক্রমানুসারে পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলিমের ওপর এই ওয়াজিব ব্যাপকতা লাভ করবে।' *আল-বাহরুর রায়িক* : ১৩/২৮৯।

Scanned by CamScanner

ওপর ওয়াজিব হবে এবং কখন ওয়াজিব হবে ইত্যাদি সবকিছু লেখা রয়েছে; কিন্তু সেখানে খলিফা বা ঝান্ডা বিদ্যমান থাকার শর্তারোপ করা হয়নি। অথচ সহিহ হাদিসে এসেছে,

> مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ
>
> লোকদের কী হলো যে, তারা আল্লাহর কিতাব-বহির্ভূত বিষয়সমূহকে শর্তারোপ করছে? যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব-বহির্ভূত কোনো বিষয়কে শর্তারোপ করবে, তা অকার্যকর হবে; যদিও সে একশ শর্ত আরোপ করে।[৩০]

শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান রাহ. জিহাদের জন্য ইমাম প্রয়োজন—এই শর্তটির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه

'কোন কিতাব বা কোন দলিল দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, অনুসৃত ইমাম না থাকলে জিহাদ ওয়াজিব হয় না? এটা দীনের ব্যাপারে কুৎসা রটানো ও মুসলমানদের পথ পরিহারের নামান্তর। এ বক্তব্যটির অসারতা প্রমাণ করার জন্য দলিলের অপেক্ষা রাখে না। তন্মধ্যে একটি হলো, জিহাদের আদেশ ও উৎসাহমূলক আয়াত-হাদিসসমূহ এবং জিহাদ ত্যাগের নিষেধ ও হুঁশিয়ারিমূলক বাণীসমূহ ব্যাপক ও উল্লেখিত শর্ত থেকে মুক্ত।'[৩১]

শায়খ সিদ্দিক হাসান খান রাহ. জিহাদের ব্যাপারে বলেন,

هذه فريضة من فرائض الدين، أوجبها الله على عباده من المسلمين، من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور

'এটা দ্বীনের ফরজসমূহের মধ্য থেকে একটি ফরজ। আল্লাহ তাআলা যা তাঁর মুসলমান বান্দাদের ওপর ফরজ করেছেন কোনো কাল, স্থান, ব্যক্তি, ইনসাফ বা জুলুমের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করা ব্যতীত।'[৩২]

---

৩০ *সহিহ বুখারি* : ২৭৩৫।
৩১ *আদ-দুরারুস সুন্নিয়্যাহ* : ৭/৯৭।
৩২ *আর-রওজাতুন নাদিয়্যাহ* : ৩৩৩।

Scanned by CamScanner

সুতরাং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে; চাই ইমাম বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক এবং চাই সেখানে ঝান্ডা বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. এবং ইবনুল কায়্যিম রাহ.-সহ অনেক ইমাম এ ক্ষেত্রে আবু বাসির রা.-এর জিহাদ দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন।[৩৩] *আহকামুল মুজাহিদ বিন-নাফস* গ্রন্থে লেখা হয়েছে,

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم ينكر على أبي بصير قتله للرجل، ولا أمر فيه بقود ولا دية .فدل على أنه ما فعله أبو بصير جائز

'যেভাবে এটা প্রমাণ হলো—নবি ﷺ আবু বাসির রা.-এর মানবহত্যার ওপর কোনো আপত্তি করেননি এবং এ ব্যাপারে কিসাস বা দিয়াতের নির্দেশ জারি করেননি।[৩৪] সুতরাং এটা প্রমাণ করল যে, আবু বাসির রা. যা করেছেন তা জায়িজ।'

তাঁর ঘটনাটি নিম্নরূপ—

(হুদায়বিয়া সন্ধি হওয়ার পর) আবু বাসির রা. নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল ﷺ-এর কাছে এলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দুজন লোক পাঠাল। তারা রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন, (তা পূর্ণ করুন)।' তিনি তাঁকে ওই দুই ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং জুল-হুলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল; আর তাদের সঙ্গে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল।

আবু বাসির রা. তাদের একজনকে বললেন, 'আল্লাহর কসম, হে অমুক, তোমার তরবারিটি খুবই চমৎকার দেখছি।' সে লোকটি তরবারিটি বের করে বলল, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারি। আমি একাধিকবার তা পরীক্ষা করেছি।' আবু বাসির রা. বললেন, 'তরবারিটি আমি দেখতে চাই। তা আমাকে দেখাও।' তারপর লোকটি আবু বাসির রা.-কে তরবারিটি দিলো। আবু বাসির রা. সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদিনায় এসে পৌঁছাল এবং দৌড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসুল ﷺ তাকে দেখে বললেন, 'এই লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে।'

ইতিমধ্যে লোকটি নবি ﷺ-এর কাছে পৌঁছে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম।' এমন সময় আবু বাসির রা.-ও সেখানে

---

৩৩ *জাদুল মাআদ* : ৩/৩০৯।

৩৪ *ফাতহুল বারি* : ৫/৪৩৯।

Scanned by CamScanner

এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ‘আল্লাহর নবি, আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফেরত দিয়েছেন—এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন।’ নবি ﷺ বললেন, ‘সর্বনাশ তার মায়ের![৩৫] সে তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বালনকারী। কেউ যদি তাঁর সঙ্গে থাকত!’[৩৬] আবু বাসির রা. যখন একথা শুনলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, রাসুল ﷺ তাঁকে আবারও কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন।[৩৭] তাই তিনি বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন।

---

৩৫ আল্লামা শাওকানি রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন,

قَوْلُهُ: (وَيْلُ امِّهِ) بِضَمِّ اللَّامِ وَوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ: وَهِيَ كَلِمَةُ ذَمٍّ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فِي الْمَدْحِ وَلَا يَقْصِدُونَ مَعْنَى مَا فِيهَا مِنَ الذَّمِّ

সর্বনাশ তার মায়ের—বাক্যটি নিন্দার বাক্য। তবে আরবরা এটাকে প্রশংসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এবং তারা এর মধ্যে যে নিন্দার ভাব রয়েছে তা উদ্দেশ্য নেয় না। আল্লামা আইনি রাহ. বলেন,

وَهِيَ كلمة: أَصْلُهَا دُعَاء عَلَيْهِ، وَاسْتعْمل هُنَا للتعجب من إقدامه فِي الْحَرْب، والإيقاد لنارها وَسُرْعَة النهوض لَهَا

এই বাক্যটি মূলত বদদুআর বাক্য। এখানে তা ব্যবহৃত হয়েছে বিস্ময় প্রকাশের জন্য। বিস্ময়ের কারণ হলো, আবু বাসির রা.-এর যুদ্ধের ব্যাপারে অগ্রসরমানতা, যুদ্ধের আগুন প্রজ্বালন করা এবং খুব দ্রুত এর জন্য উদ্যোগী হওয়া।

আল্লামা কাসতাল্লানি রাহ.-সহ অন্য মুহাদ্দিসগণও এর এই অর্থই করেছেন। যেমন, মোল্লা আলি কারি রাহ. বলেন,

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلَ أُمِّهِ) : بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، وَمَعْنَاهُ الْحُزْنُ وَالْمَشَقَّةُ وَالْهَلَاكُ وَقَدْ يَرِدُ بِمَعْنَى التَّعَجُّبِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّبَ مِنْ حُسْنِ نَهْضَتِهِ لِلْحَرْبِ وَجَوْدَةِ مُعَالَجَتِهِ لَهَا مَعَ مَا فِيهِ خَلَاصَةٌ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ

৩৬ এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলি কারি রাহ. বলেন,

(لَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ: لِأَبِي بَصِيرٍ (أَحَدٌ) . أَيْ: صَاحِبٌ يَنْصُرُهُ وَيُعِينُهُ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ يعرفُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيَّ حَتَّى لَا أَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ وَهَذَا أَنْسَبُ بِسِيَاقِ الْحَدِيثِ

যদি তার এমন কেউ থাকত, যে তাকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করত! বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো, যদি তাঁর এমন কেউ থাকত, যে তাঁকে জানিয়ে দেবে, সে যেন আমার কাছে আর ফিরে না আসে, যাতে তাঁকে মক্কাবাসীর কাছে ফিরিয়ে দিতে না হয়। এই ব্যাখ্যাটিই হাদিসের পূর্বাপরের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩৭ মোল্লা আলি কারি রাহ. বলেন,

(عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ) . قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ شَعَرَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْوِيهِ وَلَا يُعِينُهُ، وَإِنَّمَا خَلَاصُهُ عَنْهُمْ بِأَنْ يَسْتَظْهِرَ بِمَنْ يُعِينُهُ عَلَى مُحَارَبَتِهِمْ

আবু বাসির রা. বুঝতে পারলেন যে, রাসুল সা. তাঁকে আবারও কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তিনি এটা বুঝেছেন ‘সে তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বালিতকারী। যদি কেউ তাঁকে সাহায্য করত!’—কথা থেকে। কেননা, তিনি আঁচ করেছেন যে, রাসুল সা. তাঁকে আশ্রয় দেবেন না, সহযোগিতাও করবেন না। আর তাঁর মুক্তির একমাত্র পথ হলো, তার সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উল্লেখ্য, এখানে সাহায্য করার দ্বারা যুদ্ধের আগুন উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য উদ্দেশ্য। সুতরাং আবু বাসির রা. মদিনার বাইরে গিয়ে কী উদ্যোগ নিতে পারেন, সে ব্যাপারে ছোট্ট একটি ইঙ্গিত এই কথার মধ্যে রয়েছে।

Scanned by CamScanner

বর্ণনাকারী বলেন, এদিকে আবু জানদাল ইবনু সুহায়ল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবু বাসিরের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহণ করত, সে-ই আবু বাসিরের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে তাঁদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম, তারা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোনো বাণিজ্য-কাফেলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন, তাদের হত্যা করতেন ও তাদের মাল-সামান কেড়ে নিতেন। তখন কুরাইশরা নবি ﷺ-এর কাছে লোক পাঠাল। আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন করল যে, 'আপনি আবু বাসিরের কাছে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে রাসুল ﷺ-এর কাছে কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে।' (হুদায়বিয়া সন্ধির দাবি অনুসারে কুরাইশদের কাছে আর ফেরত পাঠাতে হবে না)।

তারপর নবি ﷺ তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা নিচের আয়াতসমূহ নাজিল করেন—

﴿وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْۤا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا﴾

আল্লাহই মক্কা উপত্যকায় তাদের হাতকে তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছা হতে এবং তোমাদের হাতকে তাদের পর্যন্ত পৌঁছা হতে নিবৃত্ত রেখেছেন তাদের ওপর তোমাদের ক্ষমতা দান করার পর।[৩৮] তোমরা যা কিছু করছিলে,

---

৩৮ উসমান রা. যখন মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, তখন মক্কার কাফিররা একটি দূরভিসন্ধি এঁটেছিল। তারা গোপনে তাদের ৫০ জন লোককে এই মতলবে পাঠিয়েছিল যে, তারা গুপ্ত আক্রমণ চালিয়ে মহানবি সা.-কে শহিদ করে ফেলবে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সে দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তিনি সে দলটিকে মুসলিমদের হাতে গ্রেফতার করিয়ে দেন। কুরাইশরা যখন তাদের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার খবর শুনল, তারা উসমান রা. ও তার সঙ্গীদেরকে মক্কায় আটকে ফেলল। মুসলমানরা তখন সেই ৫০ জনকে হত্যা করলে পালটা জবাবে কুরাইশরাও উসমান রা. ও তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করত। আর তার ফল হতো অনিবার্য যুদ্ধ।

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তা দেখছিলেন। এরাই তো তারা, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে নিবৃত্ত করেছে এবং আবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো কুরবানির পশুগুলোকেও যথাস্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। যদি (মক্কায়) কিছু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জানো না যে, তোমরা তাদেরকে অজ্ঞাতসারে পিষে ফেলতে,[৩৯] ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে (তবে আমি ওই কাফিরদের সঙ্গে সন্ধির পরিবর্তে তোমাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতাম। কিন্তু আমি যুদ্ধ রোধ করেছি) এ জন্য যে, আল্লাহ যাকে চান নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করেন।[৪০] (অবশ্য) সেই মুসলিমরা যদি সেখান থেকে সরে যেত, তবে আমি মক্কাবাসীর মধ্যে যারা কাফির, তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি দিতাম। কাফিররা যখন তাদের অন্তরে অহমিকাকে স্থান দিলো, যা ছিল জাহিলি যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে তাঁর রাসুল ও মুসলিমদের ওপর বর্ষণ করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে তাকওয়ার বিষয়ে স্থিত করে রাখলেন;[৪১] আর তারা তো এরই বেশি হকদার ও এর উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [সুরা ফাতহ : ২৪-২৬]

তাদের অহমিকা এই ছিল যে, তারা মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর নবি বলে স্বীকার

সুতরাং আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের মনোভাবকে বন্দি হত্যা না করার অনুকূল করে দিলেন এবং তাদের হাতকে বন্দিদের হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত রাখলেন। অথচ বন্দিরা তাদের আয়ত্তাধীন ছিল এবং মুসলিমরা তাদেরকে হত্যা করতে পরিপূর্ণ সক্ষম ছিল। অপরদিকে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হতে কুরাইশদের হাতকে আল্লাহ তাআলা এভাবে রুখে দিলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধিতেই রাজি হয়ে গেল; অথচ তারা উসমান রা.-কে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল যে, তারা কিছুতেই সন্ধি করবে না।

৩৯ মুসলিমদের যেসব হিত বিবেচনায় তখন যুদ্ধকে সমীচীন মনে করা হয়নি, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তার একটা বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে যে, তখন মক্কায় বহু মুসলিম অবস্থান করছিল। সবশেষে উসমান রা. ও তাঁর সঙ্গীগণও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ হলে তো পুরোপুরিভাবেই হতো এবং সেই ঘোরতর লড়াইয়ের ভেতর মক্কায় অবস্থিত মুসলিমদের খোদ মুসলিমদেরই হাতে তাদের অজ্ঞাতসারে কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারত, যদ্দরুণ পরবর্তীতে খোদ মুসলিমদেরই অনুশোচনা করতে হতো। মুসলিমদের যেন এমন ক্ষতির শিকার হতে না হয় এবং সেই ক্ষতির জন্য পরবর্তীতে গ্লানিবোধ করতে না হয়, তাই আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ রুখে দেন ও সন্ধি স্থাপিত করেন।

৪০ আল্লাহ তাআলা মক্কার মুসলিমদের প্রতি রহমত করেন যে, তাদেরকে হতাহতের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করলেন আর মদিনার মুসলিমদের প্রতিও রহমত করেন যে, তাদের হাতকে দীনি ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখলেন।

৪১ 'তাকওয়ার বিষয়' ছিল এটাই যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সা.-এর আনুগত্য করা হবে—আনুগত্যের বিষয়টি যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। সাহাবিগণ তা-ই করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

করেনি এবং মেনে নেয়নি। এ ছাড়া বাইতুল্লাহ ও মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।[৪২]

এই হাদিসে আমরা লক্ষ করলাম, আবু বাসির রা. ও তাঁর সঙ্গীরা ইমাম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর নির্দেশ, এমনকি অবগতি ছাড়াই জিহাদ করেছেন। কিন্তু রাসুল ﷺ তাঁকে অপরাধী হিশেবে দেখা তো দূরের কথা, উলটো তাঁর জিহাদের প্রতি মৌন সম্মতি জানিয়েছেন। আর হুদায়বিয়ার সন্ধি বাহ্যদৃষ্টিতে পরাজয় মনে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা যে তাকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করেছিলেন, আবু বাসির রা.-এর এই সফলতার মাধ্যমে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে সকলের চোখে ধরা দিলো। কাফিররা নিজেরাই তাদের বিছানো ফাঁদে আটকে গেল। বাধ্য হয়ে তারাই সন্ধির ধারা রহিত করার দাবি নিয়ে রাসুল ﷺ-এর সামনে হাজির হলো।

আবু বাসির রা. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যে সময়ে জিহাদ করেছিলেন, তখন তিনি রাসুল ﷺ-এর অধীনেও ছিলেন না এবং তিনি কোনো দারুল ইসলামেও বসবাসরত ছিলেন না। এমনকি তিনি নিজেও কোনো ইমাম ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে কোনো ঝান্ডাও ছিল না; বরং তিনি মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে তাদের সঙ্গে লড়াই করে গনিমত আহরণ করতেন এবং তা দ্বারা স্বনির্ভরতা অর্জন করতেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাসুল ﷺ তাঁকে মৌন সমর্থন দিয়েছেন ও তাঁর প্রশংসা করেছেন।

শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান রাহ. এ ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন,

هل قال رسول الله ﷺ أخطأتم في قتال قريش؛ لأنكم لستم مع إمام؟ سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله!

'রাসুল ﷺ কি তাদেরকে বলেছেন যে, কুরাইশদের সঙ্গে লড়াই করে তোমরা ভুল করেছ। কেননা, তোমরা তো কোনো ইমামের সঙ্গে ছিলে না? আশ্চর্য, মূর্খতা মূর্খদের জন্য কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে!'[৪৩]

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. *আস-সিয়ারুল কাবির* গ্রন্থে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন,

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ: اصْبِرْ، ثُمَّ ذَهَبَ فَأَصَابَ مِنْ الْعَدُوِّ غَنِيمَةً، وَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ، فَطَيَّبَهَا لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} الْآيَةُ.

---

৪২ *সহিহ বুখারি* : ২৭৩২।

৪৩ *আদ-দুরারুস সুন্নিয়্যাহ* : ৭/৯৭।

Scanned by CamScanner

'আশজা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে অভাবের অভিযোগ করে। রাসুল ﷺ তাকে বলেন, "তুমি সবর করো।" এরপর সে চলে গেল এবং শত্রুর উপর আক্রমণ করে গনিমত লাভ করে তা নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে এলো। রাসুল ﷺ তাঁর জন্য সেগুলোকে উত্তম বলে আখ্যা দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

> যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দান করেন, যা তার ধারণার বাইরে।' [সুরা তালাক : ২-৩]

ইমাম সারাখসি রাহ. এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখেন,

فَهَذَا أَصْلُ عُلَمَائِنَا فِيمَا يُصِيبُهُ الْوَاحِدُ وَالْمَثْنَى مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِذَا دَخَلُوا عَلَى وَجْهِ التَّلَصُّصِ، بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

'এক-দুজন ব্যক্তি ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকে গোপনে দারুল হারবে প্রবেশ করে যা কিছু অর্জন করে নিয়ে আসে, সে ক্ষেত্রে এটা হলো আমাদের আলিমগণের মূল দলিল।'[৪৪]

৪. জিহাদ কায়েম করা যেমন ওয়াজিব, ইমাম নিযুক্ত করাও তেমনই ওয়াজিব। তাই মুজাহিদদের জন্য আবশ্যক হলো, পূর্ব থেকে সেখানে কোনো কেন্দ্রীয় ইমাম না থাকলে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে ইমাম বানিয়ে নেওয়া। কারণ, ইমাম বিদ্যমান থাকা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়; বরং ইমামের বিদ্যমানতার জন্য (অর্থাৎ, ইমাম ইমাম হিশেবে বাকি থাকার জন্য) জিহাদ কায়েম করা শর্ত। কারণ, ইমামের রাষ্ট্র পরিচালনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য জিহাদ কায়েম করা শর্ত।

সুতরাং সঠিক ফাতওয়া হলো, জিহাদ ছাড়া কোনো ইমাম থাকতে পারে না। এটা নয় যে, ইমাম ছাড়া কোনো জিহাদ থাকে না।

শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান রাহ. বলেছেন,

كل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله، وأدى ما فرضه الله، ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام

'যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করল, তারা সকলে আল্লাহর আনুগত্য করল ও আল্লাহ

৪৪ *শারহুস সিয়ারিল কাবির* : ৪/১২৬০-১২৬১।

Scanned by CamScanner

তাআলা তাদের প্রতি যা ফরজ করেছিলেন তা আদায় করণ। আর কোনো ইমাম ইমাম থাকতে পারে না জিহাদ ছাড়া। এমন নয় যে, ইমাম ছাড়া কোনো জিহাদ থাকে না।'[৪৫]

এটা তো সকলেরই জানা যে, ইমামের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে রক্ষা করা এবং শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং তিনি যদি জিহাদ ও জনগণকে রক্ষা করতে অক্ষম হন তাহলে তিনি খিলাফত পরিচালনার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যান। বরং তখন তার বিদ্যমান থাকা ও না-থাকা বরাবর হয়ে যায়। আর যদি তিনি মুসলমানদের প্রাণ, সম্পদ ও ইজ্জত-আবরু রক্ষায় অন্তরায় হয়ে যান, তাহলে তার বিদ্যমান থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। উপরন্তু শরয়িভাবে তখন তার খিলাফত বাতিল হয়ে যায়। কেননা, তার খলিফা থাকার উদ্দেশ্য এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। হাদিস শরিফে এসেছে,

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ

ইমাম হচ্ছে ঢালস্বরূপ, যার অধীনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার দ্বারা শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়।[৪৬]

তাই ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব, যাতে তিনি ঢাল ও প্রতিবন্ধক হয়ে জনগণকে রক্ষা করতে পারেন এবং জনগণ তার অধীনে থেকে লড়াই করতে পারে। পক্ষান্তরে তিনি যদি মুসলিমদের বদলে শত্রুদের ঢাল হন তাহলে তো তিনি জাগতিকভাবে মুসলমানদের ইমাম হিশেবে বাকি থাকলেও শরয়িভাবে কিছুতেই ইমাম থাকতে পারেন না।

আমির যদি ইমারাহর উপযুক্ত না হয়, তাহলে মুসলমানদের কী করণীয়—এক হাদিসে বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً، فَسَلَّحْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَامَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَعَجَزْتُمْ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا، فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي»

উকবা ইবনু মালিক রা. বলেন, রাসুল ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। আমি তাদের একজন ব্যক্তিকে অস্ত্র হিশেবে একটি তরবারি

৪৫ *আদ-দুরারুস সুন্নিয়্যাহ : ৭/৯৭।*

৪৬ *সহিহ মুসলিম : ১৮৪১; সুনানু আবি দাউদ : ২৭৫৭।*

Scanned by CamScanner

দান করলাম। আমরা যখন রাসুল ﷺ-এর কাছে ফিরে এলাম, রাসুল ﷺ আমাদেরকে নিন্দা করে বললেন, ‘আমি যখন কোনো ব্যক্তিকে পাঠালাম আর সে আমার নির্দেশ কার্যকর করল না, তখন তোমরা কি অক্ষম হয়ে গিয়েছিলে যে, তার স্থলে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে, যে আমার নির্দেশ কার্যকর করত?’[৪৭]

আল্লামা শাওকানি রাহ. *ওয়াবলুল গামাম* গ্রন্থে লেখেন,

ملاك أمر الإمامة وأعظم شروطها وأجل أركانها، أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين، ومتمكناً من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه، كجيش كافر أو باغ، فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته، بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الأئمة، وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين

‘খিলাফতের ভিত্তি, প্রধান শর্ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জালিমের জুলুম থেকে বাঁচিয়ে মাজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলমানরা যদি কোনো ভীতিকর অবস্থা—যেমন, কাফির বা বিদ্রোহী সেনাদলের সম্মুখীন হয় তাহলে তা প্রতিহত করতে সমর্থ হওয়া। যে শাসক এই অবস্থানে থাকে, মূলত তার ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে যে, তার আনুগত্য ওয়াজিব এবং তার বিরুদ্ধাচরণ হারাম। বরং এ কাজগুলো সম্পাদন করার জন্যই আল্লাহ তাআলা শরিয়তে ইমাম নিযুক্ত করার বিধান দিয়েছেন এবং এটাকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।’[৪৮]

আমিরের অনুপস্থিতিতে যে জিহাদ পরিচালনা করার জন্য মুজাহিদরা নিজেদের পক্ষ থেকেই আমির নির্ধারণ করে নিতে পারে, এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মুতাযুদ্ধের ঘটনা।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ» وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ: «حَتَّى أَخَذَ

---

৪৭ *আল-মুসতাদরাক*, ইমাম হাকিম : ২৫৩৯। ইমাম হাকিম রাহ. বলেন, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ। ইমাম জাহাবি রাহ.-ও তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেননি।

৪৮ *ইকলিলুল কারামাহ*, সিদ্দিক হাসান খান : ১১৪-১১৫।

Scanned by CamScanner

الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ»

আনাস রা. থেকে বর্ণিত; নবি ﷺ-এর নিকট (মুতার) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌঁছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদের জায়েদ, জাফর ও ইবনু রাওয়াহা রা.-এর শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'জায়েদ পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকে শহিদ করা হয়। তখন জাফর পতাকা হাতে অগ্রসর হলো, তাঁকেও শহিদ করে ফেলা হয়। তারপর ইবনু রাওয়াহা পতাকা হাতে নিল। এবার তাঁকেও শহিদ করে দেওয়া হলো।' এ সময়ে তার দু-চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন) 'অবশেষে সাইফুল্লাহদের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) হাতে পতাকা ধারণ করেছে; ফলত আল্লাহ তাদের ওপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন।'[৪৯]

আল্লাহ তাআলা সেই যুদ্ধে মুসলমানদেরকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিপ্রাপ্ত মহান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর হাতে মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন; কিন্তু তাঁকে রাসুল ﷺ আমির হিশেবে মনোনীত করে পাঠাননি। তিনি সর্বমোট তিনজনকে আমির বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের সকলের শাহাদাতের পর মুসলমানরা সাবিত ইবনু আকরাম রা.-এর আহ্বানে নিজেরা পরামর্শক্রমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে নিজেদের আমির হিশেবে মনোনীত করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ». قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধে রাসুল ﷺ জায়েদ ইবনু হারিসা রা.-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, 'যদি জায়েদ শহিদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবনু আবু তালিব সেনাপতি হবে। যদি জাফরও শহিদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা সেনাপতি হবে।' আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, ওই যুদ্ধে তাদের

৪৯ *সহিহ বুখারি* : ৪২৬২।

Scanned by CamScanner

সঙ্গে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবনু আবু তালিব রা.-কে তালাশ করলে তাঁকে শহিদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তাঁর দেহে তরবারি ও বর্শার ৯০টিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।'[৫০]

উপরিউক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনু হাজার রাহ. *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে লেখেন,

قال الطحاوي: هذا الأصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامة إلى أن يحضر. وكذا قال الخطابي وعنه البغوي.

'ইমাম তাহাবি রাহ. বলেন, এই মূলনীতি থেকে উদ্‌ঘাটিত হয় যে, ইমাম যখন অনুপস্থিত থাকবেন, তখন মুসলমানদের ওপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে অগ্রসর করা অপরিহার্য হবে, যে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হবে—যতক্ষণ-না ইমাম উপস্থিত হয়। ইমাম খাত্তাবি রাহ.-ও অনুরূপ বলেছেন এবং তাঁর সূত্রে বাগাবি রাহ. এই কথা বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম নববি রাহ. *আল-মিনহাজ* গ্রন্থে লেখেন,

يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه .

'ইমাম বা তার প্রতিনিধির অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ করা অপছন্দনীয় হবে।'

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শিরবিনি রাহ. লেখেন,

استثنى البلقيني من الكراهة صوراً

أحدهما: أن يفوت المقصود بذهابه للاستئذان .

ثانيهما: إذا عطل الإمام الغزو وأقبل وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد .

ثالثهما: إذا غلب على ظنه أنه لو استأذن لم يأذن له

'আল্লামা বালকিনি রাহ. অপছন্দনীয়তা থেকে কিছু ক্ষেত্রকে আলাদা করেছেন,

ক. অনুমতির জন্য যেতে হলে লক্ষ্য হাতছাড়া হয়ে যাবে।

খ. ইমাম যখন জিহাদকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে এবং তিনি ও তার সেনাবাহিনী পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে মেতে থাকবে, যেমনটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

গ. যখন এই ধারণা প্রবল হবে যে, অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেবেন না।'[৫১]

---

৫০ *সহিহ বুখারি* : ৪২৬১।

৫১ *মুগনিল মুহতাজ* : ৪/২২০।

Scanned by CamScanner

ইমাম জুওয়ায়নি রাহ. *গিয়াসুল উমাম* গ্রন্থে লেখেন,

فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي خبرة وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء فحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم.

'সময় যখন ইমামের উপস্থিতি থেকে শূন্য হবে এবং অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও জ্ঞানসম্পন্ন শাসক থেকে মুক্ত হবে তখন সব বিষয় আলিমদের দিকে ন্যস্ত হবে। সর্বস্তরের মানুষের ওপর অপরিহার্য হবে আলিমগণের কাছে প্রত্যাবর্তন করা এবং শাসনক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জারি করা।'

৫. মুসলমান ও তাদের শত্রুদের মাঝে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধকেই জিহাদ বলা হয়; তা আক্রমণাত্মক হোক কিংবা হোক প্রতিরক্ষামূলক।

শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান রাহ. বলেছেন,

كل من قام إزاء العدو وعاده واجتهد في دفعه فقد جاهد، ولا بد وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم، وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل، فإن تابعه الناس أدوا الواجب، وإن لم يتابعوه أثموا إثماً كبيراً بخذلانهم الإسلام، وأما القائم به كلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لأجره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع

'যে ব্যক্তি শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবে এবং তার প্রতিরোধে পূর্ণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, নিঃসন্দেহে সে মুজাহিদ। আর যে দলই আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলা করবে, তাদের জন্য এমন কিছু নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রয়োজন, যাদের মন্তব্য ও পরিকল্পনাকে তারা পাথেয় হিশেবে গ্রহণ করবে। আর লোকদের মধ্যে ইমাম হবার অধিকতর যোগ্য ওই ব্যক্তি, যে পরিপূর্ণভাবে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তারপর যে বেশি শ্রেষ্ঠতর, তারপর যে বেশি শ্রেষ্ঠতর। এরপর যদি লোকেরা তাকে মান্য করে, তাহলে তো তারা ওয়াজিব আদায় করে নিল। অন্যথায় তারা শক্ত গুনাহগার হবে ইসলামের এই মহান বিধানটি পরিত্যাগ করার কারণে। আর যারা এ গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করবেন (অর্থাৎ, তার সাহায্যকারী ও সহকারীবৃন্দ) তারা বিরাট সওয়াবের অংশীদার হবেন। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা এমনটিই প্রতিভাত হয়।'[৫২]

---

৫২ *আদ-দুরারুস সুন্নিয়্যাহ* : ৭/৯৮।

Scanned by CamScanner

মোটকথা, প্রকৃতপক্ষে জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর শত্রু ও আল্লাহর বন্ধুদের শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য শক্তি ব্যয় করা। আর কিতাল তথা রক্তক্ষয়ী লড়াই হচ্ছে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকার।

সুতরাং যে-কেউই শত্রুর সঙ্গে আক্রমণাত্মক বা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করবে, সেই মুজাহিদ ও তাঁর এ লড়াই জিহাদ বলে গণ্য হবে। এ লড়াইয়ে যে-কেউই মারা যাবে, সে-ই শহিদ ও দুনিয়াতে তাঁর সঙ্গে শহিদেরই আচরণ করা হবে—চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, বড় হোক বা ছোট, সুন্নি হোক বা বিদআতি, নেককার হোক বা বদকার।

যেমন, হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ 'শহিদের জানাজার নামাজ' অধ্যায়ে লেখেন,

قال الزين بن المنير: «والمراد بالشهيد قتيل المعركة - أي من المسلمين - في حرب الكفار» قال الحافظ : ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً صالحاً أو غير صالح

'জাইন ইবনুল মুনির রাহ. বলেছেনে, "শহিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রণাঙ্গনের নিহত ব্যক্তি। অর্থাৎ, কাফিরদের বিরুদ্ধে সংঘটিত লড়াইয়ে মুসলমানদের (নিহত ব্যক্তি)।" এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন-দাস, নেককার ও বদকারের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।'[৫৩]

সুতরাং এ নিয়ে আলিমগণের মাঝে দ্বিমত নেই যে, যে মুসলমানই কাফিরদের সঙ্গে সংঘটিত লড়াইয়ে মারা যাবে, দুনিয়ার বিচারে সে-ই শহিদ। এ জন্যই তাঁরা এ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন যে, তাঁর জানাজার নামাজ কি পড়া হবে নাকি হবে না? তাঁকে কি গোসল দেওয়া হবে নাকি হবে না? অধিকাংশ ফকিহ এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তাঁকে গোসলও দিতে হবে না এবং তাঁর জানাজার নামাজও পড়া হবে না। তবে তাঁরা তাঁর শহিদ হওয়া বা না-হওয়া নিয়ে দ্বিমত করেননি। কেননা, তাঁর গোসল ও নামাজ নিয়ে তাঁদের মতবিরোধের কারণ হলো তাঁরা সবাই এতে একমত যে, সে এমন শহিদ, শরিয়তে অন্যান্য মৃত মুসলমানদের তুলনায় যাঁর আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করা ও আল্লাহর দরবারে তাঁর শাহাদাত কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা হচ্ছে। কেননা, তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

---

৫৩ *ফাতহুল বারি* : ৩/৩০৯।

Scanned by CamScanner

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. (لا يقال فلان شهيد) 'অমুক শহিদ—এভাবে বলা যাবে না' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখেন,

أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي.... وإن كان مع ذلك يعطى أحكام الشهداء في الأحكام الظاهرة، ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين ببدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب

'ওহির সূত্র ছাড়া কারও ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, অমুক শহিদ। যদিও-বা তা সত্ত্বেও বাহ্যিকভাবে তাদেরকে শহিদের হুকুম প্রদান করা হবে। এ কারণেই সালাফে সালিহিনগণ বদর, উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধের মৃতদের শহিদ আখ্যাদানে একমত পোষণ করেছেন এবং এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে বাহ্যিক হুকুম আরোপ করা।'[৫৪]

আর ফিতনার লড়াই হচ্ছে ওই লড়াই, যা মুসলমানদের মাঝে জাহিলি সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা দেশ ও রাজত্ব দখল ইত্যাদি অভিলাসের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলোই হচ্ছে সেই ফিতনার লড়াই, যাতে অংশগ্রহণ করা হারাম; বরং এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো, মুসলমানদের উভয় পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা। এতে যদি একদল ফিরে আসে তাহলে যে দল ফিরে আসবে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব হবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

আর কাফির শত্রু যখন কোনো মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসে তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা কোনো ফিতনার লড়াই হতে পারে না। এমন কথা উম্মাহর বিগত আলিমগণের মধ্যে কেউই বলেননি; বরং ফিতনা তো হচ্ছে সে সময় লড়াই পরিত্যাগ করা এবং কাফির শত্রুদের প্রতিরোধ না করার মধ্যে। উপরন্তু সে সময় যুদ্ধ পরিত্যাগ করা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার পর সবচেয়ে বড় গুনাহ।

ইমাম ইবনু হাজম রাহ. বলেন,

ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم

'যে ব্যক্তি কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ করতে নিষেধ করে এবং মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহকে তাদের নিকট অর্পণ করার জন্য আদেশ করে, কুফরের পর এই ব্যক্তির

---

৫৪ *ফাতহুল বারি* : ৬/৯০।

Scanned by CamScanner

গুনাহের চেয়ে বড় আর কোনো গুনাহ নেই।'[৫৫]

এ ছাড়াও উপরে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর ফাতওয়া বিবৃত হয়েছে—ইমান আনার পর মুসলিম ভূমি থেকে শত্রুদের প্রতিহত করার চেয়ে বড় কোনো ওয়াজিব নেই।

৬. বিভিন্ন বর্ণনাসূত্রে রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

> مَنْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيدٌ، ومنْ قُتلَ دُونَ دمِهِ فهُو شهيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ، ومنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فهُو شهيدٌ
>
> যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষায় মারা যাবে সে শহিদ। যে ব্যক্তি প্রাণ রক্ষায় মারা যাবে সে শহিদ। যে ব্যক্তি দীন রক্ষায় মারা যাবে সে শহিদ। যে ব্যক্তি পরিবার রক্ষায় মারা যাবে সে শহিদ।[৫৬]

আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, এ হাদিসটি সকলের ক্ষেত্রেই ব্যাপক; বরং এ হাদিসটি একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই এবং প্রতিটি মুসলমানের জন্য বৈধ আছে যে, সে নিজের ইজ্জত-সম্মান, সম্পদ ও দীন প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করবে—যদিও সে একা হয়। এমনকি আগ্রাসী ব্যক্তি যদি তার মতো একজন মুসলিমও হয় তবুও এবং এ ক্ষেত্রে যদি সে মারা যায় তাহলে সে শহিদ হবে।

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন,

> جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»
>
> জনৈক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আল্লাহর রাসুল, কোনো ব্যক্তি যদি আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?' তিনি বললেন, 'তুমি তাকে তোমার সম্পদ দেবে না।' সে বলল, 'আচ্ছা, সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমিও তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে।' সে বলল, 'আচ্ছা, সে যদি আমাকে

৫৫ *আল-মুহাল্লা* : ৭/৩০০।

৫৬ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৪২১; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৭২; *সহিহ বুখারি* : ২৪৮০; *সহিহ মুসলিম* : ১৪১।

Scanned by CamScanner

> হত্যা করে ফেলে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাহলে তুমি একজন শহিদ।' সে বলল, আচ্ছা, 'যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি?' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।'[৫৭]

সুতরাং যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য ইমাম বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণ করাকে শর্ত হিশেবে বিবেচনা করে থাকে, সে তো এ হাদিসের নির্দেশনাকেই অকেজো করে দেয়। উপরন্তু *সহিহ মুসলিম* দ্বারা প্রমাণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. এ হাদিস দ্বারা মুসলিমের জন্য নিজেদের প্রাণ, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানের প্রতিরক্ষায় লড়াই করা জায়িজ হওয়ার ব্যাপারে দলিল প্রদান করেছেন। এমনকি আগ্রাসী ব্যক্তি যদি স্বয়ং খলিফা হয় তবুও। বাদশাহ যখন আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা.-এর জমি নিয়ে যেতে মনস্থ করে, তখন তিনি এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বাদশাহর সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[৫৮]

সুতরাং এ-জাতীয় লড়াইয়ে যেহেতু খলিফার অনুমতি গ্রহণ এবং ঝান্ডা বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়, তাহলে কাফির শত্রু থেকে নিজের প্রাণ, সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, ভূমি ও দীন প্রতিরক্ষায় কী করে তা শর্ত হতে পারে? বরং নিঃসন্দেহে সে ক্ষেত্রে এ হুকুম আরও ভালোভাবে প্রযোজ্য হবে। তখন সন্দেহাতীতভাবে ইমামের অনুমতি গ্রহণ এবং ঝান্ডা বিদ্যমান থাকা শর্ত থাকবে না।

৭. সহিহ হাদিসের গ্রন্থাদিতে 'সাহায্যপ্রাপ্ত দল'-সংক্রান্ত হাদিসসমূহও এ বিষয়টিকে সুদৃঢ় করে। যেমন,

> لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ
>
> আমার উম্মাহর একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে, যারা তাঁদের অসহযোগিতা করবে তারা তাঁদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না—যাবৎ-না আল্লাহর নির্দেশ আসে এবং তাঁরা সেই অবস্থায় থাকে।[৫৯]

---

৫৭ *সহিহ মুসলিম* : ১৪০।

৫৮ দ্রষ্টব্য—*সহিহ মুসলিম* : ১৪১। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

৫৯ *সহিহ মুসলিম* : ১৯২০; *সহিহ বুখারি* : ৭৩১১।

Scanned by CamScanner

সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে,

> لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ
>
> আমার উম্মাহর একটি দল অব্যাহতভাবে আল্লাহর দীনের ওপর যুদ্ধ করবে। তাঁরা তাদের শত্রুকে পরাস্ত করবে। যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে, তারা তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; যতক্ষণ-না তাঁদের কাছে কিয়ামত আসে এবং তাঁরা সেই অবস্থায় থাকে।[৬০]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. তাঁর সময়ে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন—শামে জিহাদরত জামাআতই হাদিসে বর্ণিত সাহায্যপ্রাপ্ত জামাআত। আর শুধু ইবনু তাইমিয়া রাহ.-ই নন; বরং তাঁর অনেক পূর্বে সাহাবি আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া রা.-ও একই কথা বলে গেছেন।[৬১]

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদিসে বর্ণিত সাহায্যপ্রাপ্ত জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মাহর অমিততেজা শার্দূল সম্মানিত মুজাহিদগণ।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ.-এর নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত জামাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

> هم الذين يقاتلون الروم، كل من قاتل المشركين فهو على الحق
>
> এঁরা হচ্ছে ওই সমস্ত লোক, যাঁরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যাঁরাই মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাঁরা হকের ওপর রয়েছে।[৬২]

এটা সবাই জানে যে, একটি দল জাতির কতিপয় লোকই হবে, পুরো জাতি হবে না। আর তাদের জিহাদ এবং বিজয়ও সে ক্ষেত্রে জাতি ও ইমাম ব্যতীতই হয়ে থাকবে। কারণ, ইমাম যদি তাদের সঙ্গে থাকতই, তাহলে তো ইমামের অনুগামী হয়ে পুরো জাতিই তাদের সঙ্গে থাকত। আর সে ক্ষেত্রে তো জাতির তুলনায় এই দলটির আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য রইল না। সুতরাং উপরিউক্ত হাদিসটি ইঙ্গিতাকারে এ কথারই জানান দিচ্ছে যে, মুসলমানদের একটি দল এককভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে

---

৬০ *সহিহ মুসলিম* : ১৯২৪, ১৯২৪, ১৫৬।

৬১ *মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসি* গ্রন্থে (২/৬৮) বর্ণনা এসেছে :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشَّامِ حَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ» وَإِنِّي أَرَاكُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ

৬২ *মাসায়িলু ইবনি হানি* : ২/১৯২।

Scanned by CamScanner

পারবে—এ ক্ষেত্রে যদি পুরো জাতি তাঁদের পরিত্যাগ করে এবং ইমামও তাঁদের সাহায্য না করে। আর জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণ করা শর্তই হতো, তাহলে হাদিসে বর্ণিত সেই দলটির জন্য জিহাদ করাও শুদ্ধ হতো না এবং আল্লাহ তাআলাও সমগ্র জাতিকে ছেড়ে তাঁদেরকে এই মহান শ্রেষ্ঠত্বে ভূষিত করতেন না।

৮. কর্মভিত্তিক ইজমা উক্তিমূলক ইজমাকে আরও বেশি জোরদার করেছে। কেননা, এ যুগে যেখানেই শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছে, সেখানে ইমাম বিদ্যমান না-থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের মোকাবিলা করে উম্মাহর প্রতিরক্ষা করেছে। যেমনটি ঘটেছে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের অধীনে ইসলামি বিশ্বের পতনের পর এবং উসমানি সালতানাতের ধ্বংসের পর। তখন আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও ভারতবর্ষসহ অন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আলিম, ফকিহ ও মুজাহিদগণ তাঁদের ভূমি ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি শত্রুর বিরুদ্ধে যারা জিহাদ করছে, তাদের জিহাদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এবং তাদের সাহায্য করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও আলিমগণ তখন ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। অথচ তখন মুসলমানদের না ছিল কোনো সাধারণ খলিফা, না ছিল সে অঞ্চলগুলোর জন্য কোনো বিশেষ আমির; আর না ছিল তাঁদের নিকট পর্যাপ্ত শক্তি; বরং এগুলো ছিল আবু বাসির রা. ও তাঁর সঙ্গীদের মতো কেবলই একটি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক যুদ্ধ, যা তাঁরা চালিয়েছেন স্বদেশ স্বাধীন হওয়া ও পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের বিতাড়িত করার আগ পর্যন্ত।

সুতরাং জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম বা ঝান্ডা বিদ্যমান থাকাকে যারা শর্ত করে থাকে, তারা বিদেশি ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত আলিম ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা জিহাদ করেছেন এবং নারী, শিশু ও ভূমি রক্ষায় শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে যত লাখ মুসলমান শহিদ হয়েছেন, তাদের সকলের জিহাদকে নাকচ করে দিচ্ছে।

৯. জিহাদ এমন একটি ইবাদত, যার তত্ত্ব, মর্মার্থ ও তাৎপর্য বোধগম্য।[৬৩] জিহাদ ইসলামি শরিয়তে বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের রক্ষা করা, তাদের শত্রুদের প্রতিহত করা, শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ করার পূর্বেই তাদেরকে

---

৬৩ الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى، وليست حكما تعبدياً محضاً غير معقول معناه

Scanned by CamScanner

ভীতসন্ত্রস্ত করা বা আক্রমণ করার পর তাদেরকে বিতাড়িত করা। সুতরাং তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব—এমন সকল পদ্ধতি বা উপায়ই অবলম্বন করা বৈধ; তা কোনো শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ হোক বা হোক সশস্ত্র যুদ্ধ, তা প্রকাশ্য যুদ্ধ হোক বা হোক মল্লযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধ এক কর্তৃপক্ষ ও ঝান্ডার অধীনে হোক বা তা ব্যতীত হোক। কেননা, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ ব্যাপারে ফকিহগণের গ্রন্থাদিতে কোনো শর্তারোপ করা হয়নি। বিশেষত প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্রে। বরং সামর্থ্যবান প্রত্যেক ছোট-বড়, ধনী-গরিব পুরুষ-নারীর ওপর দায়িত্ব হলো সাধ্যমতো প্রতিরোধ গড়ে তোলা, এমনকি পাথর দিয়ে হলেও—যেমনটি ফকিহগণ বর্ণনা করেছেন।

হাশিয়াতে বাইজুরিতে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريباً منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج، والسادة ورب المال، الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها

'যদি কাফিররা মুসলমানদের কোনো শহরে অনুপ্রবেশ করে বা শহরের কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করে, তাহলে তখন তাদের ওপর জিহাদ করজে আইন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সেই শহরবাসীদের জন্য, এমনকি তাদের নারী, শিশু, দাস ও ঋণগ্রস্তদের জন্যও জরুরি হয়ে পড়ে সাধ্যানুযায়ী উপকরণ দ্বারা কাফিরদের প্রতিহত করা। এমনকি পাথর দ্বারা হলেও তাদের জন্য তা করা উচিত।[৬৪] যদিও-বা তাদের স্বামী, অভিভাবক, মনিব ও ঋণদাতাগণ তাদেরকে অনুমতি না দেয়।'

একইভাবে জিহাদের জন্য যুদ্ধের প্রশিক্ষণ বা পর্যাপ্ত সক্ষমতা থাকা; কিংবা বিজয়ের সম্ভাবনা থাকাও শর্ত নয়।

খতিব আশ-শিরবিনি রাহ. বলেন,

الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهيلهم لقتال أم لم يمكن، ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها، وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنه كالحاضر معهم، فيجب على كل من ذكر حتى على فقير وولد ومدين ورقيق

৬৪ *হাশিয়াতে বাইজুরি* : ২/৪৯১।

Scanned by CamScanner

بلا إذن، ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم، فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد

‘কাফিরদের দ্বিতীয় অবস্থা হলো, তারা আমাদের কোনো শহরে ঢুকে পড়বে। সে ক্ষেত্রে শহরবাসীর ওপর আবশ্যক হলো তাদেরকে যথাসাধ্য প্রতিহত করা। জিহাদ তখন ফরজে আইন হয়ে যায়—যুদ্ধের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভবপর হোক বা না হোক। আর যারা কাফিরদের অনুপ্রবেশকৃত শহর থেকে সফরসীমার মধ্যে অবস্থান করবে, শহরবাসীর মাঝে লড়াইয়ের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের বিধানও হবে শহরবাসীর বিধানের মতো। কেননা, কাছাকাছি থাকার কারণে তারা যেন তাদের সঙ্গে একই শহরে বসবাস করছে। তাই উল্লিখিত সকলের ওপর, এমনকি তাদের গরিব-অসহায়, সন্তান, ঋণগ্রস্ত ও দাসদের ওপরও অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যারা সফরসীমার বাইরে থাকে, তাদের জন্য আবশ্যক হলো প্রয়োজনের সময় সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে যাওয়া। সুতরাং নিকটবর্তীদের জন্য তা ফরজে আইন হয়ে গেল এবং দূরবর্তীদের জন্য হয়ে গেল ফরজে কেফায়া।’[৬৫]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

قتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً ولا طاقة للمسلمين به، لكن يخافون إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين، فهنا صرَّح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا، ونظيره أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف، فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال

‘প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ—যেমন, কোনো জায়গায় শত্রুর এত বেশি উপস্থিতি ঘটল যে, তাদের সঙ্গে লড়াই করার মতো সামর্থ্য মুসলমানদের নেই; কিন্তু মুসলমানরা এই আশঙ্কাবোধ করছে যে, তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই না করে চলে গেলে তাদের পেছনে রয়ে-যাওয়া মুসলমানদের শত্রুরা কাবু করে ফেলবে—এ ক্ষেত্রে আমাদের আলিমগণ স্পষ্ট ফাতওয়া দিয়েছেন যে, তখন তাদের কর্তব্য হলো তারা নিজেদের জীবন ও যাদের নিয়ে তারা আশঙ্কাবোধ করছে, তারা সবাই জীবনবাজি রেখে

৬৫ *আল-ইকনা* : ২/৫১০।

Scanned by CamScanner

শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করার আগ পর্যন্ত লড়ে যাবে।'

উদাহরণস্বরূপ, শত্রুরা কোনো মুসলিম শহরে আক্রমণ করল। অপরদিকে দেখা গেল মুসলমান যোদ্ধাসংখ্যা তাদের তুলনায় অর্ধেকের চেয়েও কম; কিন্তু তখন অবস্থা এমন যে, তারা যদি লড়াই করা থেকে বিরত থাকে তাহলে শত্রুরা পবিত্র ভূমিকে জবরদখল করে নেবে। এমতাবস্থায় এবং এ-জাতীয় সকল অবস্থায় যুদ্ধগুলো হবে প্রতিরক্ষামূলক; আক্রমণাত্মক নয়। সুতরাং এ থেকে বিরত থাকা কোনোক্রমেই জায়িজ নয়।'[৬৬]

এ সবগুলো বিষয়েই উম্মাহর আলিমগণ ও ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাই প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে মুসলমানদের শক্তি-সক্ষমতা এবং বিজয়ের সম্ভাবনা প্রবল থাকা বা না-থাকা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না; বরং মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষায় নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জানা থাকা সত্ত্বেও শরীরে রক্তের শেষ বিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমরণ লড়ে যেতে হবে।

ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেন,

ولا أرى ضيقاً على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسراً أو يبادر الرجل، وإن كان الأغلب أنه مقتول

'আমি নিহত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো দলের উপর খালি হাতে আক্রমণ করা বা আকস্মিকভাবে হামলা করার মধ্যে কোনো সমস্যা দেখি না।'[৬৭]

ইমাম শাফিয়ি রাহ. এ ফাতওয়া দিয়েছেন আক্রমণাত্মক জিহাদের ব্যাপারে। সুতরাং স্পষ্ট যে, প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্রে তা আরও ভালোভাবে প্রযোজ্য হওয়ার দাবি রাখে।

প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটাও শর্ত নয় যে, তা আল্লাহর দীনকে উচ্চকিত করার জন্য হতে হবে। তবে হ্যাঁ, জিহাদের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রকার সেটাই, যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ

---

৬৬ *আল-ফাতাওয়াল মিসরিয়্যাহ* : ৪/৫০৯।

৬৭ *কিতাবুল উম্ম* : ৪/১৭৮।

Scanned by CamScanner

لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»

একব্যক্তি নবি ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'একব্যক্তি গনিমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং একব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে শরিক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।'[৬৮]

অপর বর্ণনায় হাদিসের শব্দগুলো এভাবে বিবৃত হয়েছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

একব্যক্তি নবি ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কোনটি? কেননা, আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশবর্তী হয়ে; আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।' তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, প্রশ্নকারী ছিল দাঁড়ানো। তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর বাণী বিজয়ী করার জন্য যে যুদ্ধ করে তার লড়াই আল্লাহর পথে হয়।'[৬৯]

হাদিসটি দ্বারা প্রকৃত মুজাহিদের পরিচয় ফুটে উঠেছে; কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, যার উদ্দেশ্য আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা না হয়ে অন্য কিছু হবে, তার জিহাদ শুদ্ধই হবে না। বরং তা শুদ্ধ হবে; কিন্তু নিয়তের পরিশুদ্ধি না থাকার কারণে যে কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা তার লাভ করার কথা ছিল, সে তা লাভ করতে সমর্থ হবে না। কারণ, যারা ইজ্জত-সম্মান, সম্পদ ও প্রাণ রক্ষার লড়াইয়ে মারা যাবে, হাদিসের ঘোষণানুযায়ী তারাও শহিদ হবে।[৭০] সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে একাকী বা দলবদ্ধভাবে প্রাণ, সম্পদ, সম্ভ্রম ও ভূমি প্রতিরক্ষার জন্য। বিভিন্ন শ্রেণির মুসলমানদের সহায়তা নিয়ে তা সম্পাদিত হয়। এমনকি দেশ রক্ষার্থে চুক্তিবদ্ধ

---

৬৮ *সহিহ বুখারি* : ২৮১০।

৬৯ *সহিহ বুখারি* : ১২৩।

৭০ *সহিহ বুখারি* : ২৪৮০; *সহিহ মুসলিম* : ১৪১; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৪২১; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৭২

Scanned by CamScanner

অমুসলিমদের সঙ্গে মিলেও এই প্রকারের যুদ্ধ সম্পাদিত হতে পারে।

একইভাবে কাফির শত্রুদের থেকে মুসলমানদের প্রাণ, সম্পদ, সম্ভ্রম ও ভূমি রক্ষায় অমুসলিম জনগণ ও অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। রাসুল ﷺ-ও মদিনার ইয়াহুদিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন শত্রু কর্তৃক মদিনা আক্রমণকালে মদিনার প্রতিরক্ষার জন্য। একইভাবে শাম ও ইরাকে অবস্থানকারী সাহাবিগণও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালিত করার জন্য আরব খ্রিষ্টানদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. তাঁর সঙ্গে বের হওয়া শামের নাগরিকদের নিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; অথচ সে সময় তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিদআতি ছিল। এ ছাড়াও তিনি চুক্তিবদ্ধ ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান বন্দিদেরকে তাতারদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাতারদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করার পর তারা যখন শুধু মুসলমানদের মুক্তি দিতে চাচ্ছিল তখন তিনি এতে সম্মত হননি। বাধ্য হয়ে তারা মুসলমানদের পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বন্দিদেরও মুক্ত করে দিয়েছিল।

মোটকথা, প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোনো কিছুই শর্ত নয়। ইমাম বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, ঝান্ডা বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, আল্লাহর দীন বুলন্দ করার ইচ্ছা করাও শর্ত নয়, কোনো আলিমের ফতোয়াও শর্ত নয়, কাতার এক হওয়াও শর্ত নয়, পর্যাপ্ত শক্তি থাকাও শর্ত নয়, বিজয়ের সম্ভাবনা থাকাও শর্ত নয়। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, মুজাহিদদের জন্য এককাতারে এক আমিরের অধীনে থেকে জিহাদ করা ওয়াজিব নয়। এটা ওয়াজিব বটে; কিন্তু তা জিহাদের শুদ্ধতার জন্য শর্ত নয়। তাই যে ক্ষেত্রে অসম্ভব হবে, সে ক্ষেত্রে এই অজুহাত দেখিয়ে কিছুতেই জিহাদ পরিত্যাগ করা যাবে না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত অবিরল জিহাদ চলবে।[৭১]

---

৭১ শাইখ ড. হাকিম আল মুতাইরি, শাইখ ড. মুহাম্মাদ খাইর হাইকাল এবং শাইখ ড. ইয়াসির বুরহামির ফাতওয়া অবলম্বনে রচিত।

Scanned by CamScanner

ইমারাহ ও খিলাফাহ কী ও কেন

এক. ইমারাহর প্রকারভেদ

ইমাম ইবনু জামাআহ রাহ. তাহরিরুল আহকাম গ্রন্থে লেখেন,

الإمارة قسمان: عامة وخاصة. أما الإمارة العامة: فهي الخلافة.

ইমারাহ দুই প্রকার : ব্যাপক ইমারাহ ও সীমিত ইমারাহ। ব্যাপক ইমারাহ হলো খিলাফাহ শব্দের সমার্থক।[৭২]

সুতরাং বোঝা গেল ইমারাহ শব্দটি খিলাফাহ শব্দের তুলনায় ব্যাপক। ইমারাহ শব্দের একটি ব্যবহার হলো খিলাফাহর সমার্থক। তবে ইমারাহ শব্দটি খিলাফাহ ছাড়া অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এর দ্বারা ব্যাপক ইমারাহ নয়; বরং সীমিত ইমারাহ উদ্দেশ্য হয়।

দুই. ইমারাহর বিধান

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

হে ইমানদাররা, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের ও তোমাদের মধ্যে যারা ইমারাহর অধিকারী তাদের। [সুরা নিসা : ৫৯]

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

---

৭২ তাহরিরুল আহকাম : ৭৯।

Scanned by CamScanner

তাদের কাছে যখন কোনো সংবাদ আসে, তা শান্তির হোক বা ভীতির, তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসুল বা যারা ইমারাহর অধিকারী, তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী, তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত। [সুরা নিসা : ৮৩]

উপরিউক্ত আয়াত দুটো দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে ইমারাহর অধিকারী ব্যক্তিবর্গ থাকবে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম জনসাধারণের ওপর যাদের আনুগত্য করার এবং সংশয়পূর্ণ বিষয় যাদের দিকে ন্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এমন কোনো কিছুর আদেশ করেন না, যা অসম্ভব ও সাধ্যাতীত। যেহেতু তিনি ইমারাহর অধিকারীদের আনুগত্য করার আদেশ করেছেন, সুতরাং প্রতি যুগেই ইমারাহর অধিকারী ব্যক্তিবর্গ থাকবে। আর স্বীকৃত মূলনীতি হলো, কুরআনে যখন আদেশবাচক ক্রিয়া ব্যবহার হয়, তখন সাধারণভাবে তা অপরিহার্যতা বোঝায়। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে হবে, যে তাদের আমির হবে। আর জনসাধারণের জন্য অপরিহার্য হবে তার আনুগত্য করা। তবে আমিরের আনুগত্য নিঃশর্ত হবে না; বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের অধীন হবে। যার কারণে 'আল্লাহ' ও 'রাসুল' শব্দদ্বয়ের শুরুতে স্বতন্ত্রভাবে 'আনুগত্য করো' ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হলেও 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমারাহর অধিকারী তাদের' আনুগত্য নির্দেশ করার জন্য 'আনুগত্য' শব্দটির পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, মূলত আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। আমির যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তার আনুগত্য মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেরই আনুগত্য হয়।

রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে আমির বানিয়ে নেয়।[৭৩]

আল্লামা শাওকানি রাহ. বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَإِذَا شُرِّعَ هَذَا لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلَاةٍ مِنَ

৭৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬০৮, ২৬০৯; *সহিহ ইবনু খুজায়মা* : ২৫৪১।

Scanned by CamScanner

الْأَرْضِ أَوْ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُمِ وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ وَاجِبَةٌ.

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন, "তিনজন ব্যক্তি যদি পৃথিবীর কোনো প্রান্তরে থাকে, তাহলে তাদের জন্য একজনকে আমির বানানো ছাড়া বসবাস বৈধই হবে না।" ইমাম আহমদ রাহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মাত্র তিনজন ব্যক্তি কোনো প্রান্তরে থাকলে বা সফরে বের হলে তাদের জন্যই যখন আমির নির্ধারণ করার বিধান শরিয়ায় বিধিবদ্ধ হলো তখন বিপুলসংখ্যক মানুষ যদি মফস্বলে বা নগরে বসবাস করতে থাকে এবং তারা পারস্পরিক অত্যাচার প্রতিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ সমাধানের দিকে মুখাপেক্ষী থাকে, তাদের জন্য এই শরিয়াসিদ্ধি তো আরও অধিক উপযুক্ত ও সমীচীন। এই হাদিসে সেসব ইমামের বক্তব্যের দলিল রয়েছে, যারা বলেন মুসলমানদের ওপর শাসক, প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করা ওয়াজিব। আর অধিকাংশ আলিমই এই মত পোষণ করেছেন যে, শাসনকার্য ওয়াজিব।'[৭৪]

ইমাম শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا بِهَا.

'জেনে রাখা অপরিহার্য, মানুষের বিষয়-আশয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা দীনের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবসমূহের মধ্যে অন্যতম; বরং দীন ও দুনিয়া কোনোটাই এ ছাড়া চলতে পারে না।'[৭৫]

সুতরাং ব্যাপক অর্থে ইমারাহর অপরিহার্যতা কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত।

তিন. আমিরুল মুমিনিন

'আমিরুল মুমিনিন' ও 'খলিফাতুল মুসলিমিন' শব্দ দুটো সমার্থক। আমিরুল মুমিনিন উপাধিটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তার পর থেকে এ দুটো শব্দ সমার্থক হিশেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং সাধারণ আমির শব্দের তুলনায় আমিরুল মুমিনিন শব্দটি ব্যাপক। একটি খিলাফাহভিত্তিক রাষ্ট্রের অধীনে অনেক ইমারাহ থাকতে পারে। যেমন, উমর রা.-এর যুগে ইয়ামেন, শাম এবং

---

৭৪ *নাইলুল আওতার* : ৮/২৯৪।

৭৫ *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ২৮/৩৯০।

Scanned by CamScanner

মিসরে ইমারাহ ছিল। তবে তা স্বতন্ত্র ছিল না; বরং কেন্দ্রীয় ইমারাহর নেতৃত্বেই তা পরিচালিত হতো। আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ইমারাতে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকত; যাদেরকে 'আমির' বা 'ওয়ালি' ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হতো। এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, আমিরুল মুমিনিন একজনই হন। তবে তার অধীনে আরও অনেক আমির থাকতে পারে, যারা হবে তার প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত।

চার. 'ব্যাপক ইমারাহ' বা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বিধান

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের সর্বসম্মত মত হলো, মুসলমানদের জন্য খলিফা থাকা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবি, মাওয়ারদি, নববি এবং ইবনু হাজম রাহ. প্রমুখ বিদগ্ধ আলিমগণ উম্মাহর ইজমা বর্ণনা করেছেন।[৭৬] প্রতিটি ইজমার ভিত্তি হয় কুরআন ও সুন্নাহ। খিলাফার প্রতিষ্ঠা উম্মাহর ওপর অপরিহার্য—এই মাসআলার ওপর গোটা উম্মাহ যে ঐকমত্য পোষণ করেছে, এর পেছনে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর দলিল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লিখিত দলিলগুলোর পাশাপাশি এই হাদিসটিও এক সুদৃঢ় ভিত্তি—

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

> যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার গলায় কোনো বায়আত নেই, সে জাহিলি মৃত্যুবরণ করল।[৭৭]

হাদিসে উল্লেখিত 'বায়আত' দ্বারা খলিফার উদ্দেশে প্রদত্ত বায়আত উদ্দেশ্য। এই সহিহ হাদিসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানদের কোনো একজন খলিফা থাকতে হবে। যেই যুগে মুসলমানদের কোনো খলিফা থাকবে না, তা হবে জাহিলি যুগ। তবে আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এখানে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—যে যুগে মুসলমানদের কোনো খলিফা থাকে না, সে যুগে যারা মারা যাবে তারা সবাই কি জাহিলি মৃত্যুবরণ করবে? আমরা উত্তরে বলব—না, যদি খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের যথাযথ প্রচেষ্টা থাকে, তাহলে তাদের মৃত্যু জাহিলি মৃত্যু

---

৭৬ দ্রষ্টব্য—*আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, কুরতুবি : ১/২৬৪; *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, মাওয়ারদি : ৫; *শরহু সহিহ মুসলিম*, নববি : ১২/২০৫; *আল-ফাসল*, ইবনু হাজম : ৪/৮৭। প্রয়োজনে আরও দেখুন—শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ. রচিত *ইজালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা*, আল্লামা তাফতাজানি রাহ. রচিত *শারহুল আকায়িদ* এবং মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি রাহ. রচিত *আকায়িদুল ইসলাম*।

৭৭ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৫১।

Scanned by CamScanner

হবে না ইনশাআল্লাহ। খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বাস্তবায়িত হবে, যারা দীনের বিজয় ও শরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের প্রাণ, সম্পদ ও সর্বস্ব উৎসর্গ করে আল্লাহর পথে তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে বায়আত প্রদান করার মাধ্যমে। তবে আমরা এই বায়আতকে ওয়াজিব বলি না। আমরা বলি, আশা করা যায় এই বায়আত আল্লাহর কাছে ওজর হিশেবে বিবেচিত হবে। বান্দা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, 'হে আমার প্রতিপালক, যারা পৃথিবীতে খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ছিল, তাদেরকে বায়আত দেওয়ার মাধ্যমে আমি আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি। সুতরাং তুমি আমার অপারগতা ক্ষমা করো, আমার ত্রুটি মার্জনা করো।'

হাদিসে যে জাহিলি মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে—এটা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যে খলিফা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরিয়ার দৃষ্টিতে বিবেচ্য কোনো অপারগতা ছাড়া তাকে বায়আত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। আর এখানে বায়আত দেওয়া দ্বারা খলিফার বায়আত সংঘটিত হওয়া এবং বৈধ সব বিষয়ে তার আনুগত্য অপরিহার্য হওয়ার বিশ্বাস লালন করা উদ্দেশ্য। কারণ, দারুল ইসলামে খলিফা হওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের বায়আত গ্রহণ করা শর্ত নয়, এমনকি বর্তমানকালে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তা সম্ভবও নয়।

পাচ. খলিফার শর্তাবলি

খলিফার শর্তাবলি নিম্নরূপ :

- মুসলিম হওয়া।[৭৮]
- প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।[৭৯]
- সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া।[৮০]
- স্বাধীন হওয়া।[৮১]
- পুরুষ হওয়া।[৮২]

---

৭৮ সুরা নিসা : ৪১; সুরা নিসা : ৫৯; *আহকামু আহলিজ জিম্মাহ, ইবনুল কায়্যিম* : ২/৭৮৭; *শরহু সহিহ মুসলিম*, নববি : ১২/২২৯।

৭৯ সুরা নিসা : ৫; *আল-ফাসল*, ইবনু হাজম : ৪/৮৯।

৮০ *মারাতিবুল ইজমা*, ইবনু হাজম : ১৫৪।

৮১ *ফাতহুল বারি* : ২০/১৬০।

৮২ *আল-ফাসল*, ইবনু হাজম : ৪/৮৯।

Scanned by CamScanner

- ন্যায়পরায়ণ হওয়া।[৮৩]
- কুরাইশ বংশের হওয়া।[৮৪] তবে কুরাইশ বংশের যোগ্য কাউকে না পাওয়া গেলে অন্য কেউও খলিফা হতে পারবে।[৮৫]
- লোভী, প্রার্থী বা ক্ষমতালিপ্সু না হওয়া।[৮৬]

উপরিউক্ত শর্তগুলো সর্বসম্মত। সুতরাং এর কোনোটি অবিদ্যমান থাকলে ব্যক্তি খলিফা হওয়ার যোগ্য থাকে না। আর দুটো শর্ত রয়েছে মতবিরোধপূর্ণ :

১. ইজতিহাদের যোগ্য হওয়া। ইমাম শাতিবি[৮৭], ইমাম রামালি[৮৮] রাহ. প্রমুখ ফকিহগণের মতে খলিফা হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত। তবে ইমাম শাহরাসতানি[৮৯], ইমাম গাজালি[৯০] রাহ. প্রমুখ বিদগ্ধগণের মতে এটা শর্ত নয়। তবে তাঁদের মতানুসারে খলিফা নিজে যদি মুজতাহিদ না হন তাহলে নিদেনপক্ষে তার এতটুকু ইলম থাকা বাঞ্ছনীয়, যতটুকু একজন শাসকের ইসলামি তরিকায় শাসনকার্য চালানোর জন্য জরুরি। আর এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আলিম ও ফকিহ উপদেষ্টা থাকা অপরিহার্য, শরয়ি বিষয়াদিতে যার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২. দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও আত্মা সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া, যাতে তিনি শাসন ও বিচারকার্য, রাজনীতি ও সমর সবকিছুই সুচারুরূপে পরিচালনা করতে সক্ষম হন। ইমাম মাওয়ারদি[৯১] ও ইমাম আবু ইয়ালা[৯২] রাহ. এ শর্তটির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এটা কোনো সর্বসম্মত শর্ত নয়। সুতরাং এটাকে চূড়ান্ত অপরিহার্য বলাও সমীচীন নয়।

---

৮৩ *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, কুরতুবি : ১/২৭০।
৮৪ *সহিহ বুখারি* : ৭১৩৯, ৭১৪০; *মুসনাদু আহমাদ* : ২০/২৪৯; *শরহু সহিহ মুসলিম* : ১২/২০০।
৮৫ *মুসনাদুল বাজ্জার* : ৬১৮১; *তারিখে তাবারি* : ২/৫৮০; *ফাতহুল বারি* : ১৩/১১৯; *আত-তাহরির আলাল মুখতার* : ১/৬৮।
৮৬ *সহিহ বুখারি* : ৬৭৩০; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৩৩।
৮৭ *আল-ইতিসাম* : ২/১২৬।
৮৮ *নিহায়াতুল মুহতাজ* : ৭/৪০৯।
৮৯ *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল* : ১/১৫৩।
৯০ *ফাজায়িহুল বাতিনিয়্যাহ* : ১৯১।
৯১ *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, মাওয়ারদি : ১/৫।
৯২ *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, আবু ইয়ালা : ২০।

Scanned by CamScanner

ছয়. খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য আমরা প্রথমে ফিরে যাই খিলাফাতে রাশিদার যুগে। কারণ, রাসুল ﷺ আমাদেরকে তাঁর আদর্শ ও তাঁর মহান খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। চার খলিফার নির্বাচন-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল এই :

ক. আবু বকর রা. নির্বাচিত হয়েছিলেন সাহাবিদের স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনের দ্বারা। প্রথমে সাকিফায় আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ সাহাবিরা তাঁকে খলিফা হিশেবে নির্বাচিত করেছিলেন। এরপর মসজিদে সাধারণ বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

খ. আবু বকর রা. মৃত্যুর পূর্বে উমর রা.-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিশেবে মনোনীত করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর তিরোধানের পর উমর রা. স্থলাভিষিক্ততার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেন। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ সাহাবিরাও তাঁকে মেনে নেন। পরবর্তীতে মসজিদে মুসলিম জনসাধারণের কাছ থেকে সাধারণ বায়আত নেওয়া হয়।

গ. উমর রা. তাঁর শাহাদাতের পূর্বে ছয় সদস্যবিবিশিষ্ট একটি শুরা-পরিষদ গঠন করে দিয়ে যান। পরবর্তীতে তাঁরা উসমান রা.-এর ব্যাপারে একমত হয়ে তাঁকে খলিফা হিশেবে মনোনীত করেন; আর মুসলিম জনসাধারণ তাঁকে বায়আত দেয়।

ঘ. উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর অনেক প্রবীণ সাহাবির পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলি রা. মসজিদে মুসলিম জনসাধারণের থেকে সাধারণ বায়আত গ্রহণ করেন। সে সময় তালহা ও জুবায়ের রা.-এর মতো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ সাহাবিরাও তাঁকে বায়আত প্রদান করেন। ফলে তিনি খলিফা হিশেবে নির্বাচিত হন। তাঁর নির্বাচনপদ্ধতি আবু বকর রা.-এর নির্বাচনপদ্ধতির মতোই ছিল।

সুতরাং সাহাবিদের জীবনী থেকে আমরা খলিফা নির্বাচনের তিন ধরনের পদ্ধতির কথা জানতে পারি। ইমাম নববি রাহ. বলেন,

وَأَجْمَعُوا عَلَى انْعِقَادِ الْخِلَافَةِ بِالِاسْتِخْلَافِ وَعَلَى انْعِقَادِهَا بِعَقْدِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ يَسْتَخْلِفِ الْخَلِيفَةُ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْخَلِيفَةِ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِالسِّتَّةِ

Scanned by CamScanner

'এ ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা রয়েছে যে, স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার দ্বারা খিলাফাহ সম্পন্ন হয়। আর খলিফা যদি কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে না যান, তাহলে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনের দ্বারাও তা সম্পন্ন হয়। এবং তারা আরও ইজমা করেছেন যে, পূর্ববর্তী খলিফার জন্য পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব কোনো জামাআতের মধ্যে পরামর্শের বিষয় হিশেবে রেখে যাওয়াও জায়িজ; যেভাবে উমর রা. ছয় সদস্যের পরামর্শ-পরিষদ গঠন করে রেখে গিয়েছিলেন।'[১৩]

সাত. খলিফার ব্যাপারে সকল মুসলিমের ঐকমত্য ও আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকা কি শর্ত

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, খলিফার বায়আত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সকলের ঐকমত্য শর্ত নয়। আলি রা.-কে তাঁর সময়ে সকল মুসলমান বায়আত দেয়নি। এমনকি অনেক প্রবীণ সাহাবিও তাঁকে বায়আত দেননি। এতদ্‌সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর চতুর্থ খলিফা ছিলেন। ইমাম জুওয়াইনি রাহ. *আল-গিয়াসি* গ্রন্থে লেখেন,

مما نقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع.

'কথাটা আমরা অকাট্যতার সঙ্গে বলব তা হলো, সর্বসম্মতিক্রমে খিলাফাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য সকলের ঐকমত্য শর্ত নয়।'[১৪]

তবে এটা ঠিক যে, খলিফার বায়আত শুদ্ধ হওয়ার জন্য অধিকাংশ মুসলিমের ঐকমত্য থাকা শর্ত, যাতে করে সকলের দ্বারা মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় প্রতাপ ও সুসংহত প্রতিরক্ষা-শক্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ইমাম জুওয়াইনি রাহ. লেখেন,

الشوكة لا بد من رعايتها، ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن يصلح للإمامة وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة.

'শক্তির প্রতি লক্ষ করার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় করে সকল আলিমের ঐকমত্য। কারণ, তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন—আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি যদি খিলাফাহর যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে একান্তে

---

১৩ *শরহু সহিহ মুসলিম*, নববি : ১২/২০৫।

১৪ *আল-গিয়াসি* : ৫২।

Scanned by CamScanner

নিয়ে তাকে বায়আত প্রদান করে, তাহলে তাঁর জন্য খিলাফাহ সাব্যস্ত হবে না।’[৯৫]

খিলাফাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য মুসলমানদের আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকা শর্ত। কারণ, খলিফাকে নির্বাচন করেছে মুসলমানরাই। সুতরাং এটা মূলত তার মাঝে ও মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক চুক্তি। আর পারস্পরিক চুক্তি সম্পন্ন হয় আন্তরিক সন্তুষ্টির সঙ্গে; বাধ্যতা ও জোরের সঙ্গে নয়।

قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ... مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ

‘আবদুর রহমান ফিরে এসে বললেন, “যদি আপনি ওই লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমিরুল মুমিনিনের কাছে এসেছিল এবং বলেছিল—আমিরুল মুমিনিন, অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি, যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি উমর মারা যান তাহলে অবশ্যই অমুকের হাতে বায়আত করব। আল্লাহর কসম, আবু বকরের বায়আত আকস্মিক ব্যাপার-ই ছিল। ফলে তা হয়ে যায়।” একথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হলেন। তারপর বললেন, “ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যায় আমি লোকদের মধ্যে অবশ্যই দাঁড়াব; আর তাদেরকে ওই সব লোক থেকে সতর্ক করে দেবো, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়।... যে-কেউ মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোনো লোকের হাতে বাইআত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ওই লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হবার আশঙ্কা রয়েছে।”’[৯৬]

উমর রা. বলেন,

> مَنْ بَايَعَ أَمِيرَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ
>
> যে ব্যক্তি কোনো পরামর্শ ছাড়া মুসলমানদের সার্বিক দায়-দায়িত্বের বায়আত প্রদান করবে, তার বায়আত হবে না।[৯৭]

হাফিজ ইবনু হাজার রাহ. বলেন, ঘটনাটির প্রেক্ষাপট থেকে প্রতিভাত হয় যে, উমর

---

৯৫ *আল-গিয়াসি* : ৫৬।

৯৬ *সহিহ বুখারি* : ৬৮৩০।

৯৭ *আল-মুসান্নাফ*, ইবনু আবি শায়বা : ৩২৮৬৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৯১।

Scanned by CamScanner

রা.-এর আপত্তি ওই ব্যক্তির ওপর ছিল, যে মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে বায়আত দিতে চেয়েছে।[৯৮]

সুতরাং একথা স্পষ্ট হলো যে, খলিফা যদি নির্বাচিত হয় তাহলে তার নির্বাচন হতে হবে মুসলমানদের ঐকমত্য ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। কিন্তু উপরে আমরা দেখেছি, খলিফা নির্বাচনের একমাত্র পদ্ধতি এটা নয়; বরং তিনি পূর্ববর্তী খলিফার মনোনয়নের দ্বারাও নির্ধারিত হতে পারেন।[৯৯] যেমন, সহিহ হাদিসে এসেছে,

> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: «إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللهِ ﷺ» فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: «رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لاَ لِي وَلاَ عَلَيَّ، لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا»
>
> আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, উমর রা.-কে বলা হলো, 'আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলিফা মনোনীত করে যাবেন না?' তিনি বললেন, 'যদি আমি খলিফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন—অর্থাৎ, আবু বকর—তিনি খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন—অর্থাৎ, রাসুল ﷺ—তিনি খলিফা মনোনীত করে যাননি।' এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, 'কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি, আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান—না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।'[১০০]

খলিফা যদি পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন তাহলে সে ক্ষেত্রেও মুসলমানদের ঐকমত্য ও সন্তুষ্টি থাকা শর্ত। ইমাম আবু ইয়ালা রাহ. লেখেন,

> الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين.

'কেবল দায়িত্ব প্রদানের দ্বারাই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য খিলাফাহ সম্পন্ন হবে না; বরং তা সম্পন্ন হবে মুসলমানদের শপথের দ্বারা।'[১০১]

---

৯৮ *ফাতহুল বারি* : ১২/১৫৪।
৯৯ *আল-আকহামুস সুলতানিয়্যাহ*, মাওয়ারদি : ১০।
১০০ *সহিহ বুখারি* : ৭২১৮।
১০১ *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, মাওয়ারদি : ২৫।

Scanned by CamScanner

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. লেখেন,

وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما.

আবু বকর রা. যখন উমর রা.-এর উদ্দেশে দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন, এরপর তিনি তখনই খলিফা হিশেবে নির্ধারিত হয়েছেন, যখন মুসলমানরা তাঁকে বায়আত দিয়েছে এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে। যদি এমন হতো যে, মুসলমানরা আবু বকর রা.-এর মনোনয়ন কার্যকর না করতেন এবং তাঁকে বায়আত না দিতেন, তাহলে তিনি খলিফা হতে পারতেন না।'[১০২]

তিনি আরও লেখেন,

عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له.

'কিছু মানুষের নির্বাচনের দ্বারাই উসমান রা. খলিফা হয়ে যাননি; বরং তিনি মুসলিম জনসাধারণের বায়আতের দ্বারা খলিফা হয়েছেন।'[১০৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি যখন মুসলমানদের ওপর জোর খাটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়, ফিতনা এড়ানোর স্বার্থে তাকেও খলিফা হিশেবে মেনে নেওয়া হয়।[১০৪] তবে এটা খলিফা নির্ধারণের কোনো আদর্শ পদ্ধতি নয় এবং তা নববি ধারার খিলাফাহও নয়। এখানে আমাদের আলোচনা নববি ধারার খিলাফাহ তথা খিলাফাতে রাশিদা সম্পর্কে; জোরপূর্বক দখলকৃত স্বেচ্ছাচারপূর্ণ খিলাফাহ সম্পর্কে নয়।

আট. আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কারা

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হচ্ছে আলিম-উলামা, মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ, সমাজের নেতাগণ এবং বড় বড় ব্যবসায়ীগণ।[১০৫] নারী, চুক্তিবদ্ধ কাফির ও দাসরা যতই মহৎ গুণের অধিকারী হোক না কেন তারা কখনো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। রাসুল ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রীগণ, আয়েশা রা.-এর মতো বিদগ্ধ ফকিহ ও ফাতিমা রা.-এর মতো জান্নাতের সর্দার নারীর সঙ্গে সাহাবিগণ খলিফা নির্বাচণ বিষয়ে পরামর্শ করেননি। তাঁদেরকে শুরা

---

১০২ *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ইবনু তাইমিয়া : ১/১৪২।

১০৩ *মিনহাজুস সুন্নাহ*, ইবনু তাইমিয়া : ১/৫৩২।

১০৪ *সহিহ বুখারি* : ৬৯৩; *রাওজাতুত তালিবিন*, নববি : ১০/৪৬।

১০৫ *মুগনিল মুহতাজ*, নববি : ৪/১৩০; *কাশশাফুল কিনা*, বাহুতি : ৬/১৫৯।

Scanned by CamScanner

বা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত করেননি; অথচ তাদের মর্যাদা বিশেষত আয়েশা ও ফাতিমা রা.-এর পূর্ণাঙ্গতা হাদিস দ্বারা স্বীকৃত।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ যারা হবেন তাদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্ত হলো :

- একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার জন্য তার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকা অপরিহার্য—যেমন, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি—আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের প্রতিটি সদস্যের মধ্যেই তা থাকা অপরিহার্য।
- এই পরিমাণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, যার দ্বারা খিলাফাহর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারণ করতে পারেন।
- যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা ও পর্যাপ্ত হিকমাত তথা প্রজ্ঞা, সচেতনতা ও বিচক্ষণতা থাকাও অপরিহার্য।
- আস্থাবান ও নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরি, যাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরো জাতি সহজেই ঐকমত্য প্রদর্শন করে এবং যাদের নির্বাচন সকলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয়।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। প্রয়োজন ও বাস্তবতা অনুসারে তার সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ যেহেতু সমাজের সব শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই তাদেরও রুচিশীল, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সব গোত্র ও গোষ্ঠী থেকে নির্ধারণ করা হয়, যাতে করে তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জাতির কোনো দ্বিধা না থাকে। বায়আতের বাক্যমালা ছিল সাধারণত এরকম,

> بايعناك راضين على إِقَامَة الْعدْل وَالْقِيَام بفروض الْإِمَامَة على كتاب الله وَسنة رَسُوله [ﷺ]
>
> আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আপনার হাতে বায়আত করছি এর ওপর যে, আপনি কুরআন ও রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ মোতাবিক খিলাফাহর দায়িত্বসমূহ পালন করবেন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন।[১০৬]

নয়. সীমিত ইমারাহ

সীমিত ইমারাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি জামাআতসমূহের ইমারাহ। দীনের সাহায্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের ব্যাপারে

---

১০৬ *তাহরিরুল আহকাম ফি তাদবিরি আহলিল ইসলাম*, ইবনু জামাআহ : ১/৫৭।

Scanned by CamScanner

মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

> তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না। [সুরা মায়িদা : ২]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

> তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং বিক্ষিপ্ত হয়ো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০৩]

﴿أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

> তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা করো এবং এ ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ো না। [সুরা শুরা : ১৩]

সুতরাং দীন প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা। তবে দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পন্থা কী হবে—শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

وَلَنْ يَقُومَ الدِّينُ إِلَّا بِالْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْحَدِيدِ. كِتَابٌ يَهْدِي بِهِ وَحَدِيدٌ يَنْصُرُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} فَالْكِتَابُ بِهِ يَقُومُ الْعِلْمُ وَالدِّينُ. وَالْمِيزَانُ بِهِ تَقُومُ الْحُقُوقُ فِي الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ والقبوض. وَالْحَدِيدُ بِهِ تَقُومُ الْحُدُودُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ.

'দীন প্রতিষ্ঠিত হবে শুধু কিতাব, তুলাদণ্ড এবং লোহার দ্বারা। পথপ্রদর্শনকারী কিতাব এবং সাহায্যকারী লোহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, "বস্তুত আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।" [সুরা হাদিদ : ২৫]

কিতাবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে জ্ঞান ও দীন। তুলাদণ্ডের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে আর্থিক লেনদেন ও করায়ত্তকরণের হকসমূহ। আর লোহার দ্বারা কাফির ও মুনাফিকদের

Scanned by CamScanner

ওপর দণ্ড প্রয়োগ হবে।'[১০৭]

আয়াতে তুলাদণ্ড বলে বোঝানো হয়েছে এমন বস্তুকে, যা দ্বারা কোনো জিনিস মাপা হয়। তা অবতীর্ণ করার অর্থ, আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা দ্বারা ন্যায়ানুগ পরিমাপ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিগণ ও তাঁর কিতাবের সঙ্গে তুলাদণ্ডের উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের উচিত তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিমিতি রক্ষা করা। সেই ভারসাম্য ও পরিমিতির শিক্ষাই নবি-রাসুলগণের কাছে ও আসমানি কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

আর আয়াতে বিশেষভাবে লোহার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। লোহা এমনই এক ধাতু, সব শিল্পেই যার দরকার পড়ে। কাজেই এর সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি বড় নিয়ামত। নবিগণ, আসমানি কিতাব ও তুলাদণ্ডের পর লোহার উল্লেখ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, মানবসমাজের সংস্কার-সংশোধনের প্রকৃত উপায় নবিগণের জীবনাদর্শ ও তাদের আনীত কিতাব। এর যথাযথ অনুসরণ দ্বারাই দুনিয়ায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু জগতে অপশক্তিও কম নেই, যা এসব শিক্ষা দ্বারা সমাজ-সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে এবং সর্বত্র অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কর্মের বিস্তার ঘটিয়ে সমাজদেহকে কলুষিত করে। সেই সব অপশক্তির শিরোশ্ছেদের জন্য আল্লাহ তাআলা লোহা সৃষ্টি করেছেন। তা দ্বারা বিভিন্ন রকমের সমরাস্ত্র তৈরি হয় এবং পরিশেষে তা জিহাদে ব্যবহার করা যায়।

যেহেতু শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা ও ইসলামি খিলাফাহ পুনরুদ্ধার করা মুসলিম উম্মাহর ওপর অপরিহার্য; আর মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছাড়া বাহ্যত তা সম্ভব নয়, এ জন্য এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে উম্মাহর জামাআতবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর একথা স্পষ্ট যে, ইমারাহ ছাড়া কোনো জামাআত হয় না। কারণ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলে কোনোভাবেই ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না। জামাআতের মধ্যেই শরিয়া বাস্তবায়ন করা যায় না। আমিরুল মুমিনিন উমর রা. বলেন,

إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ ، كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ

জামাআত ছাড়া কোনো ইসলাম হয় না। ইমারাহ ছাড়া কোনো জামাআত হয় না; আর আনুগত্য ছাড়া কোনো ইমারাহ হয় না। সম্প্রদায় যাকে ফিকহের ভিত্তিতে

১০৭ *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ৩৫/৩৬।

Scanned by CamScanner

নেতা বানায়, সে তার নিজের জন্য ও সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য প্রাণের সঞ্জীবনী হয়। আর যাকে তার সম্প্রদায় ফিকহ ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে নেতা বানায়, সে তার নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়।[১০৮]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةِ وَإِمَارَةٍ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ؛ وَلِهَذَا رُوِيَ: {أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ}. وَيُقَالُ {سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ} . وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ.

‘যেহেতু আল্লাহ তাআলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ অপরিহার্য করে দিয়েছেন; আর (রাষ্ট্রীয়) শক্তি ও ইমারাহ ছাড়া তা পরিপূর্ণ হয় না। একইভাবে আল্লাহ আরও যেসব বিষয় অপরিহার্য করেছেন—যেমন : জিহাদ, ন্যায়পরায়ণতা, হজ জুমআ ও ইদ কায়েম করা, মাজলুমের সাহায্য করা এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা—এর কোনোটিই প্রতাপ ও ইমারাহ ছাড়া পূর্ণতা পায় না। এ জন্যই বর্ণিত হয়েছে, শাসক পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়াস্বরূপ। কথিত আছে, শাসক ছাড়া যাপিত এক রাত অপেক্ষা জালিম শাসকের সঙ্গে ৬০ বছর যাপন করা অধিক উপযুক্ত। অভিজ্ঞতা এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করে তোলে।’[১০৯]

তিনি আরও বলেন,

وَأَمَّا « رَأْسُ الْحِزْبِ » فَإِنَّهُ رَأْسُ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَتَحَزَّبُ أَيْ تَصِيرُ حِزْبًا فَإِنْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ لَهُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ وَنَقَصُوا مِثْلَ التَّعَصُّبِ لِمَنْ دَخَلَ فِي حِزْبِهِمْ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِزْبِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهَذَا مِنْ التَّفَرُّقِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَمَرَا بِالْجَمَاعَةِ والائتلاف وَنَهَيَا عَنْ التَّفرقَةِ وَالِاخْتِلَافِ وَأَمَرَا بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَنَهَيَا عَنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

---

১০৮ *সুনানুদ দারিমি* : ২৫৩।

১০৯ *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ২৮/৩৯০।

Scanned by CamScanner

'মুমিনরা যে দলে আবদ্ধ হবে, সেই দলের একজন প্রধান থাকবেন। যদি তারা কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা কিছুর আদেশ করেছেন তার ভিত্তিতে দলবদ্ধ হয়, তাহলে তারা মুমিন। মুমিনদের জন্য যা কিছু প্রযোজ্য, তাদের জন্য তার সবকিছু প্রযোজ্য। মুমিনদের ওপর যা কিছু অবধারিত, তাদের ওপরও তার সবকিছু অবধারিত। তবে যদি তারা হ্রাস-বৃদ্ধি করে—যেমন, তাদের দলে যারা অন্তর্ভুক্ত হবে, হক ও বাতিল সব ব্যাপারে তাদের প্রতি সাম্প্রদায়িকতা লালন করে; আর যারা তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে না, তারা হকের ওপর থাক বা বাতিলের ওপর, তাদেরকে উপেক্ষা করে, তাহলে এটা সেই বিভক্তি বলে বিবেচিত হবে, যার নিন্দা করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ জামাআত ও সম্প্রীতির আদেশ করেছেন। বিভক্তি ও মতবিরোধ থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কেউ কারও সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন।'[১১০]

যখন পৃথিবীতে ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন ইসলামের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত দীনি জামাআতসমূহের আমির তো সাধারণভাবে খলিফাই নির্ধারণ করে দেবেন। কিন্তু যখন ইসলামি খিলাফাহ থাকবে না; কিংবা কোনো অপারগতার কারণে খলিফার সঙ্গে পরামর্শ করে তার সিদ্ধান্ত জানা সম্ভব হবে না, তখন মুসলমানদের ওপর কর্তব্য হবে পারস্পরিক পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো একজনকে আমির হিশেবে মেনে নেওয়া।

খলিফার অনুপস্থিতিতে যে জিহাদ ও অন্যান্য দীনি জামাআত পরিচালনা করার জন্য মুমিনরা নিজেদের পক্ষ থেকেই আমির নির্ধারণ করে নিতে পারবে, এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মুতাযুদ্ধের ঘটনা।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ» وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ: «حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ»

আনাস রা. থেকে বর্ণিত; নবি ﷺ-এর নিকট (মুতার) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌঁছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে জায়েদ, জাফর

---

১১০ *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ১১/৯২।

Scanned by CamScanner

ও ইবনু রাওয়াহা রা.-এর শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘জায়েদ পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকে শহিদ করা হয়। তখন জাফর পতাকা হাতে অগ্রসর হলো, তাঁকেও শহিদ করে ফেলা হয়। তারপর ইবনু রাওয়াহা পতাকা হাতে নিল। এবার তাঁকেও শহিদ করে দেওয়া হলো।’ এ সময়ে তার দু-চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন) ‘অবশেষে সাইফুল্লাহদের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) হাতে পতাকা ধারণ করেছে; ফলত আল্লাহ তাদের ওপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন।’[১১১]

আল্লাহ তাআলা সেই যুদ্ধে মুসলমানদের ‘সাইফুল্লাহ’ উপাধিপ্রাপ্ত মহান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর হাতে মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে রাসুল ﷺ আমির হিশেবে মনোনীত করে পাঠাননি। তিনি সর্বমোট তিনজনকে আমির বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাদের সবার শাহাদাতের পর মুসলমানরা সাবিত ইবনু আকরাম রা.-এর আহ্বানে নিজেরা পরামর্শক্রমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে নিজেদের আমির হিশেবে মনোনীত করে নেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ». قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধে রাসুল ﷺ জায়েদ ইবনু হারিসা রা.-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, ‘যদি জায়েদ শহিদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবনু আবু তালিব সেনাপতি হবে। যদি জাফরও শহিদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা সেনাপতি হবে।’ আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, ওই যুদ্ধে তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবনু আবু তালিব রা.-কে তালাশ করলে তাঁকে শহিদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তাঁর দেহে তরবারি ও বর্শার ৯০টিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।[১১২]

---

১১১ *সহিহ বুখারি* : ৪২৬২।
১১২ *সহিহ বুখারি* : ৪২৬১।

Scanned by CamScanner

উপরিউক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনু হাজার রাহ. *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে লেখেন,

قال الطحاوي: هذا الأصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامة إلى أن يحضر. وكذا قال الخطابي وعنه البغوي.

'ইমাম তহাবি রাহ. বলেন, এই মূলনীতি থেকে উদ্ঘাটিত হয় যে, ইমাম যখন অনুপস্থিত থাকবেন, তখন মুসলমানদের ওপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে অগ্রসর করা অপরিহার্য হবে, যে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হবে—যতক্ষণ-না ইমাম উপস্থিত হয়। ইমাম খাত্তাবি রাহ.-ও অনুরূপ বলেছেন এবং তার সূত্রে বাগাবি রাহ. এই কথা বর্ণনা করেছেন।'

তিনি আরও লেখেন,

قَوْلُهُ بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ أَيْ جَازَ ذَلِكَ... قَالَ ابن الْمُنِيرِ يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ مَنْ تعين لِوِلَايَةٍ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْإِمَامِ أَنَّ الْوِلَايَةَ تَثْبُتُ لِذَلِكَ الْمُعَيَّنِ شَرْعًا وَتَجِبُ طَاعَتُهُ حُكْمًا كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إِذَا اتَّفَقَ الْحَاضِرُونَ عَلَيْهِ

'ইমাম বুখারি রাহ. অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন : 'শত্রুর আশঙ্কার কারণে যুদ্ধে যে ব্যক্তি খলিফার পক্ষ থেকে ইমারাহর দায়িত্ব ব্যতিরেকেই আমির হয়।' অর্থাৎ, এটা বৈধ।... ইবনু মুনির রাহ. বলেন, অধ্যায়ের হাদিস থেকে যে মাসআলা গৃহীত হয় তা হলো, যে ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্য নির্ধারিত হয় আর তার ব্যাপারে ইমামের কাছে গিয়ে সিদ্ধান্ত জানা দুষ্কর হয়, শরিয়ার দৃষ্টিতে সেই নির্ধারিত ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিধানগতভাবে তার আনুগত্য অপরিহার্য হবে। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তার ব্যাপারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একমত হবে।'[১১৩]

এর পক্ষে আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো রাসুল ﷺ-এর সেই বাণী, যেখানে তিনি বলেছেন,

> لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
>
> এই দীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মুসলমানদের এক দল এর ওপর লড়াই চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ-না কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১৪]

---

১১৩ *ফাতহুল বারি* : ৬/১৮০।

১১৪ *সহিহ মুসলিম* : ১৯২২।

Scanned by CamScanner

لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

আমার উম্মাহর একটি দল আল্লাহর আদেশের ওপর সর্বদা লড়াই চালিয়ে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের পরাভূত করবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না—যতক্ষণ-না কিয়ামত আসে এবং তারা সেই অবস্থায় থাকে।[১১৫]

এসব হাদিসের আলোকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারি থাকবে। কখনো তা বন্ধ হবে না। অথচ কিয়ামত পর্যন্ত যে খিলাফাহ থাকবে না, এটা অসংখ্য হাদিসের আলোকেই আমরা জানতে পারি। রাসুল ﷺ বলেন,

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

অবশ্যই ইসলামের হাতলগুলো একে একে ভেঙে ফেলা হবে। যখন একটা হাতল ভাঙবে তখন লোকেরা এর পরবর্তী হাতল আঁকড়ে ধরে থাকবে। সর্বপ্রথম যে হাতলটি ভেঙে যাবে তা হলো শাসনক্ষমতা আর সর্বশেষটি হলো নামাজ।[১১৬]

হুজায়ফা রা. বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ

তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, নবুওয়াত থাকুক। এরপর যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন

---

১১৫ *সহিহ মুসলিম* : ১৯২৪।

১১৬ *মুসনাদু আহমাদ* : ২১১৩৯।

Scanned by CamScanner

উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ। খিলাফাহ ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে দাঁত কামড়ে থাকা রাজত্ব। তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে জবরদস্তিমূলক রাজত্ব। তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। তারপর আবার প্রতিষ্ঠিত হবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।[১১৭]

আনাস রা.-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ বলেছেন,

إِنَّهَا نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ، ثُمَّ جَبْرِيَّةٌ، ثُمَّ طَوَاغِيتُ

নিশ্চয়ই এখন রয়েছে নবুওয়াত ও রহমত। এরপর আসবে খিলাফাহ ও রহমত। তারপর আসবে দাঁত কামড়ে-থাকা রাজত্ব। এরপর আসবে জবরদস্তি। তারপর তাগুতগোষ্ঠী।[১১৮]

সুতরাং খলিফা বিদ্যমান না থাকলেও দীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত জামাআতগুলোর আমির বিদ্যমান থাকবে। জামাআতের সদস্যরা নিজেরাই পারস্পরিক পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাউকে আমির হিশেবে মনোনীত করবে। তাদের ওপর সেই আমিরের আনুগত্য করা অপরিহার্য হবে। খলিফার অনুপস্থিতিতে পুরো দীনের সামাজিক সব কাজকর্মকে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর ফেলে রাখার কোনোই সুযোগ নেই। আর ইসলামি জামাআতগুলোর কর্তব্য হলো, পারতপক্ষে নিজেরা অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত না হওয়া; বরং শরিয়া প্রতিষ্ঠা ও খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরা এক ইমারাহর অধীনে এক ঝান্ডার ছায়াতলে কাজ করা।[১১৯] তবে একান্ত যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ইমারাহর অধীনে লড়াই চালিয়ে যাওয়াও বৈধ হবে। কিন্তু এক অঞ্চলে একাধিক কিতালপন্থী জামাআত না থাকাই সমীচীন। অন্যথায় বিভিন্ন মতবিরোধকে কেন্দ্র করে লড়াই কুফফারের সঙ্গে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে, যা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক ক্ষতিকারক।

---

১১৭ *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৪০৬।

১১৮ *আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল-ফিতান* : ৪২০।

১১৯ প্রমাণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—সুরা আনফাল : ৪৬

Scanned by CamScanner

দশ. আমিরুল মুমিনিনের বায়আত ও অন্য আমিরদের বায়আতের মধ্যে পার্থক্য

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি স্মরণ রাখা জরুরি, দীনের সাহায্যে কর্মরত যেকোনো জামাআত মুসলমানদের একমাত্র জামাআত নয়; বরং মুসলমানদের জামাআতসমূহের মধ্য থেকে একটি জামাআত মাত্র। যার কারণে হাদিসে মুসলমানদের জামাআত থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে যেসব শাস্তির হুঁশিয়ারি বর্ণিত হয়েছে, তা এসব জামাআত থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। যেমন, রাসুল ﷺ বলেন,

> مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
>
> যে লোক নিজ আমিরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, সে যেন তাতে ধৈর্যধারণ করে। কেননা, যে লোক জামাআত থেকে এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে, তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলি মৃত্যুর মতো।[১২০]

উপরিউক্ত হাদিসটি আমিরুল মুমিনিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর তাতে যে জাহিলি মৃত্যুর কথা উল্লেখিত হয়েছে, এটা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যে আমিরুল মুমিনিনের বায়আত ভঙ্গ করে মুসলমানদের জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যায়।

আমিরুল মুমিনিনের বায়আত ও অন্য আমিরদের বায়আতের মধ্যে মোটাদাগে যে সকল পার্থক্য রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. আমিরুল মুমিনিনকে প্রদত্ত বায়আত হলো গোটা মুসলিম উম্মাহ ও একজন ব্যক্তির মধ্যে খিলাফাহর দায়িত্বের ব্যাপারে কৃত চুক্তি। পক্ষান্তরে অন্যান্য আমিরকে প্রদত্ত বায়আত হলো গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে নয়; বরং উম্মাহর নির্দিষ্টসংখ্যক কিছু ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো আনুগত্যের ব্যাপারে বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কৃত চুক্তি।

২. আমিরুল মুমিনিনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু শর্ত উপস্থিতি থাকা জরুরি। যেমন, কুরাইশ বংশের হওয়া বা ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা। অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে সেসব শর্ত থাকা জরুরি নয়। সুতরাং কুরাইশি বা মুজতাহিদ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ সীমিত ইমারাহর আমির হতে পারে।

৩. আমিরুল মুমিনিনকে প্রদত্ত বায়আত গোটা উম্মাহর কল্যাণে কাজ করার

---

১২০ *সহিহ বুখারি* : ৭০৫৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৪৯।

Scanned by CamScanner

জন্য এবং ইসলামের সর্বপ্রকার বিধিবিধানের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য হয়ে থাকে। যার প্রেক্ষিতে উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের ওপর তার আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়—যতক্ষণ-না তার থেকে এমন কোনো দোষ প্রকাশ পায়, যা তার বায়আতকে রহিত করে দেয়। অপরদিকে অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের ওপর তাকে বায়আত দেওয়া হবে—যেমন : জিহাদ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, মাজলুমের সাহায্য ইত্যাদি—তার ওপর কেবল সেই কাজেরই দায় বর্তাবে। কেননা, আমিরুল মুমিনিনের দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবেই শরিয়ার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর অন্যান্য আমিরদের ক্ষেত্রে তাকে যে বিষয়ের বায়আত দেওয়া হবে এবং যে শব্দে বায়আত দেওয়া হবে, তার ওপর শুধু তার দায়-দায়িত্বই বর্তায়।

৪. আমিরুল মুমিনিনের বায়আত সকল মুসলিমের ওপর অপরিহার্য থাকে। কেউ চাইলেও তার নির্দেশ অমান্য করার বা তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করার সুযোগ থাকে না। রাসুল ﷺ বলেন,

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»

বনি ইসরাইলের নবিগণ তাঁদের উম্মাহকে শাসন করতেন। যখন কোনো একজন নবি মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবি নেই। তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবিগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ করছেন?' তিনি বললেন, 'তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়আতের হক আদায় করবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ওই সকল বিষয়ে, যে-সবের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল।'[১২১]

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

---

১২১ *সহিহ বুখারি* : ৩৪৫৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৪২।

Scanned by CamScanner

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার গলায় কোনো বায়আত নেই, সে জাহিলি মৃত্যুবরণ করল।[১২২]

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ

তুমি মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে।[১২৩]

অন্যান্য আমিরের আনুগত্য সবার ওপর অপরিহার্য থাকে না; বরং যারা তাকে বায়আত দিয়েছে এবং যে বিষয়ের বায়আত দিয়েছে, কেবল তাদের জন্য সে বিষয়ে আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন, জিহাদি জামাআতের আনুগত্য করা গোটা মুসলিম উম্মাহর ওপর অপরিহার্য হবে না; বরং সেই জামাআতের সদস্য যারা হবে, যারা তাকে বায়আত দেবে, তার আনুগত্য কেবল তাদের ওপরই অপরিহার্য হবে।

৫. আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্যের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই; বরং তা সর্বদা অপরিহার্য থাকে। যতক্ষণ-না আমিরুল মুমিনিন মৃত্যুবরণ করেন; কিংবা তিনি আমিরুল মুমিনিন থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন, ততক্ষণ বিনা বাক্যব্যয়ে তার আনুগত্য করে যেতে হয়। অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে আনুগত্যের বায়আত নির্দিষ্ট সময় বা কাজের সঙ্গে সীমাবদ্ধ হতে পারে। যখন সেই সময় শেষ হবে বা সেই কাজ সম্পন্ন হবে, তার পর আর তার আনুগত্য অপরিহার্য থাকবে না।

৬. একই সময়ে একাধিক আমিরুল মুমিনিন হতে পারে না। গোটা বিশ্বের ইমাম, খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন হবেন মাত্র একজন। অন্যান্য আমিরদের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে তাতে ভিন্ন ভিন্ন আমির হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন জিহাদি জামাআতের আমির, একজন তাবলিগি জামাআতের আমির, একজন দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের আমির ইত্যাদি।

৭. যত হাদিসে মুক্তভাবে বায়আত শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, সেসব হাদিস আমিরুল মুমিনিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য। সুতরাং দীনি কোনো জামাআতের জন্য এসব হাদিসকে যথাস্থানে প্রয়োগ না করে ভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করা বৈধ নয়। যেমন, কিছু মানুষের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো বিষয়ে বায়আত

---

১২২ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৫১।

১২৩ *সহিহ বুখারি* : ৭০৮৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৪৭।

Scanned by CamScanner

লাভ করেই নিজেকে আমিরুল মুমিনিন মনে করা, আমিরুল মুমিনিনের জন্য নির্ধারিত হক ভোগ করা বা নিজেকে তার সমস্তরের মনে করা, কেউ বায়আত ভঙ করে দল ত্যাগ করলে তার বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য করা—সে হত্যার উপযুক্ত বা সে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহিলি মৃত্যুবরণ করবে প্রভৃতি।

তবে স্মর্তব্য যে, আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্য যেমন ওয়াজিব, তেমনি অঙ্গীকারাবদ্ধ বিষয়গুলোতে অন্যান্য আমিরদের আনুগত্যও ওয়াজিব।[১২৪] কারণ, কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গীকার পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। [সুরা মায়িদা : ১; সুরা ইসরা : ৩৪] শরিয়া বান্দার ওপর যা অপরিহার্য করেছে, তা মান্য করা যেমন ওয়াজিব; বান্দা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের ওপর যা অপরিহার্য করে নিয়েছে, তা মান্য করাও ওয়াজিব। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মানত।

৮. আমিরুল মুমিনিনের বায়আত ভঙ্গ করে মুসলমানদের জামাআত ত্যাগ করলে তাকে বিদ্রোহী হিশেবে বিবেচনা করা হবে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে তাকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা হবে। পক্ষান্তরে জিহাদ ফরজ থাকা অবস্থায় কেউ যদি জিহাদি জামাআত পরিত্যাগ করে বা তা থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে, তাহলে সে যদিও গুনাহগার হবে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না এবং তার ওপর শক্তি প্রয়োগ করে তাকে জোরপূর্বক আনুগত্য করতে বাধ্য করা যাবে না।

৯. সীমিত ইমারাহর আমিরদের অধীনে পরিচালিত জামাআত ত্যাগ করা এবং তা থেকে অব্যাহতি নেওয়া বৈধ; কিন্তু আমিরুল মুমিনিনের বায়আত ভঙ করে মুসলমানদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ নয়।

১২৪ *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ২৮/১৯-২০।

Scanned by CamScanner

কী আছে বইটিতে

অন্ধকার যখন গাঢ় হয়, তখন ভোরের সূর্যোদয়ও নিকটবর্তী হয়। মুসলিম উম্মাহ এখন ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সময় অতিক্রম করছে। উম্মাহ এখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। এক শতাব্দী ধরে তাদের নেই কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, নেই জাতিগত ঐক্য। ফলে গোটা পৃথিবীর মানচিত্রটা এখন নিরপরাধ মুসলিমদের রক্তে লাল হয়ে আছে। তাদের বুকের তপ্ত খুনে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখছে কুফরের ধ্বজাধারীরা। এমতাবস্থায় উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্য কার্যকর দিকনির্দেশনা দরকার। যারা চক্ষুষ্মান, তাদের কাছে সমস্যা স্পষ্ট; কিন্তু সমাধানের পথ খুঁজে খুঁজে যুবকরা রীতিমতো হয়রান। বিপদের কথা সচেতন সবার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে; কিন্তু বিপদ থেকে উত্তরণের পথ কেউ দেখাচ্ছে না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্যই হলো উম্মাহকে তাদের করণীয় সম্পর্কে সজাগ করা, হারানো ঐতিহ্য ও গৌরব পুনরুদ্ধার করার পথনির্দেশ করা।

যেসব বিষয় নিয়ে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আলোচনা এসেছে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ : 'জিহাদ করতে চাই; কিন্তু কীভাবে', 'যেভাবে এ দেশে দীন কায়েম হবে', 'নিষ্ক্রিয় সমর্থক যখন "মানহাজি ভাই"', 'ফোরথ জেনারেশন ওয়ারফেয়ার এবং গাজওয়া ম্যানহাটন', 'নিকটবর্তী শত্রুর ধোঁকা', 'গ্লোবাল জিহাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ', 'শাসক ছাড়া কীভাবে জিহাদ করব', 'ইমারাহ ও খিলাফাহ কী ও কেন'।

বলাবাহুল্য, উম্মাহর কেন্দ্রীয় সমস্যার সমাধান প্রদান করা যারতার কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন উম্মাহর প্রতি যথার্থ কল্যাণকামিতা, সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বাস্তবিক ময়দানের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং শরিয়াহর মেজাজ-চাহিদার ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যুৎপত্তি ও সচেতনতা। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের রচয়িতা উম্মাহর যেসব সাহসী মনীষীর চিন্তাধারার আলোকে তাঁর রচনাকর্ম সমাপ্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যে এই গুণগুলো পূর্ণরূপে উপস্থিত ছিল। যার কারণে এই গ্রন্থটিকে এ যুগের তাওহিদবাদী মুমিনদের জীবনপথের পাথেয় বললেও ইনশাআল্লাহ অত্যুক্তি হবে না।

তবে যেহেতু এটা বিক্ষিপ্ত রচনার সংকলন, যার কোনো কোনো রচনা দুয়েক বছর আগের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে লেখা হয়েছে; আর সংগত কারণে আমরা সেগুলোকে আপন অবস্থায়ই বহাল রেখেছি, তাই কিছু কিছু তথ্য খানিকটা পুরানো মনে হতে পারে। এরপরও এতে সবশ্রেণির পাঠকের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত খোরাক, রয়েছে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের পরম স্নিগ্ধতা।

রেনেসাঁ

রাত পোহাবার কত দেরি
মুফতি আবু জান্দাল জালালাবাদী
মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

Scanned by CamScanner